বিজ্ঞান সাধক
প্রফুল্ল চন্দ্র



মণি বাগচি

বয়স্ক শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার মান অনুসারে রচিত

ভারতের বিজ্ঞানসাধক চরিতমালা

বিজ্ঞানসাধক প্রফুল্লচন্দ্র

মণি বাগচি

দিবাকর সেন
কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত

S. C. E. R. T.
Library
Calcutta
B. C. Road

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক :
রবীন বল
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য

LIBRARY
Date 16.5.06
Accn. No. 12175

দাম : দশ টাকা

মুদ্রাকর :
মনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ, দীনবন্ধু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত উন্নয়নের ফলে পাঠ্যবস্তুর বিষয় শুধু নয় দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা গভীর ভাবে সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে—তাই ভারতীয় প্রতিটি ভাষাতেই প্রচুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রয়োজন। শুধু বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাতেই নয়, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও বিজ্ঞান শিক্ষার জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন রয়েছে। অথচ বৃহৎ সংখ্যক জনসাধারণ বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ পান না,—ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রয়োগ সম্পর্কেও তারা কিছু জানতে পারেন না। অথচ আজকের দিনে বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান ও প্রয়োগ সম্পর্কে সকলেরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশের বয়স্ক শিক্ষার্থী ও নব্য শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করেই জনপ্রিয় বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হল। ছড়া ও গল্প পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বিজ্ঞান চর্চাও আজকের দিনে সকলের পক্ষেই জরুরি।

বিশেষতঃ বয়স্ক শিক্ষার্থী ও নব্য শিক্ষার্থীদের জন্য এ জাতীয় গ্রন্থ রচনা দুরূহ কাজ। তাই ভাষা ও শব্দ চয়নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যাদের উদ্দেশে রচিত তাদের কিছু মাত্র কাজে লাগলে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিনীত—

প্রকাশক

'আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, সে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।

'বাস্তব জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর গুহাস্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না।

'সংসারে জ্ঞান-তপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।...আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।'

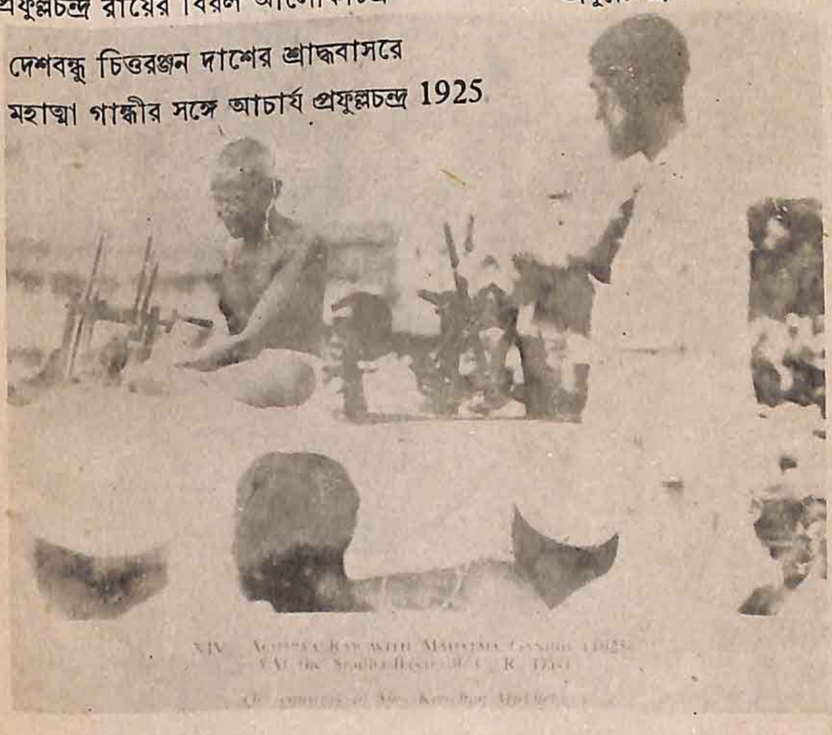
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



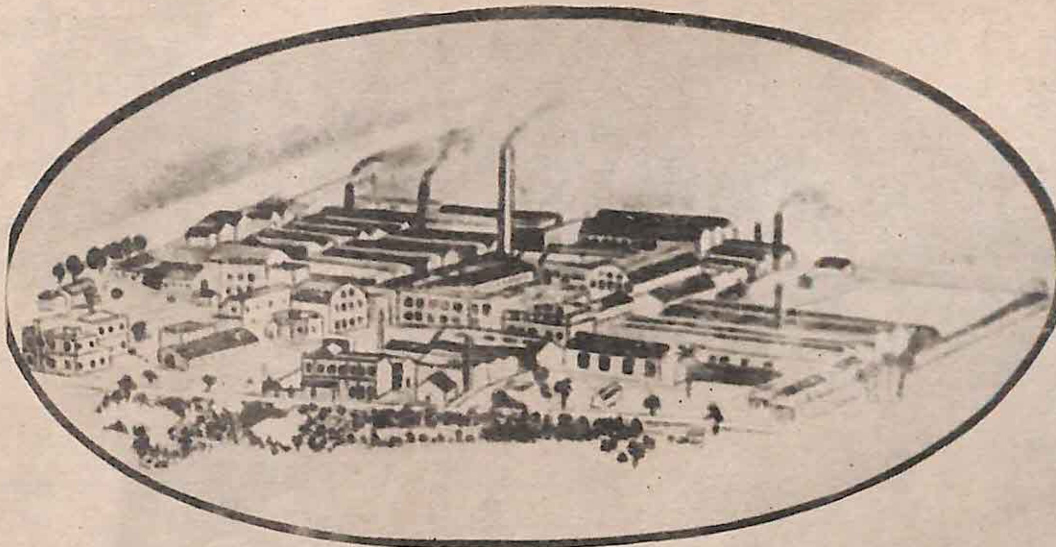


1896 সালে তোলা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিরল আলোকচিত্র

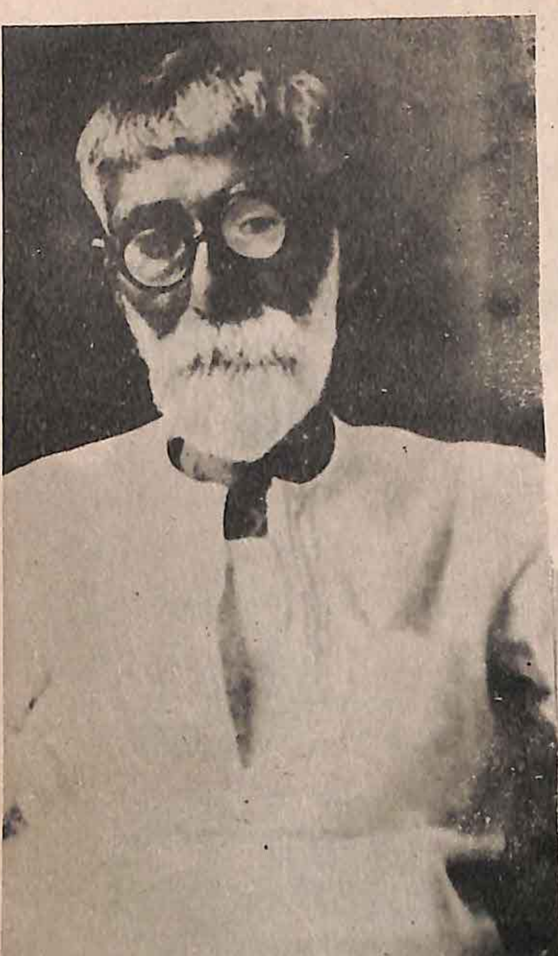
1926 সালে তোলা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 1925

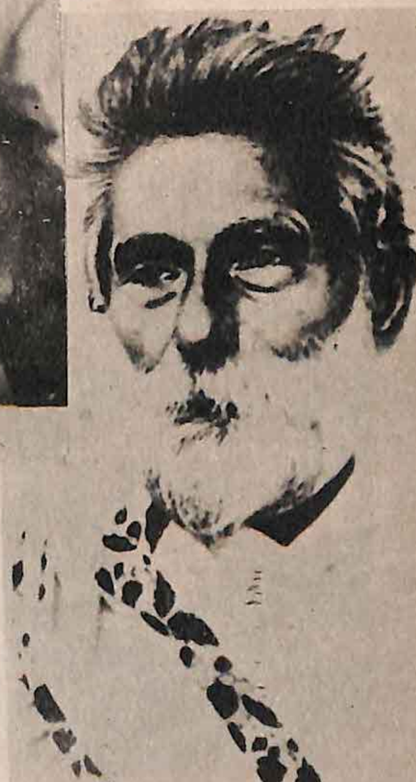


বেঙ্গল কেমিক্যাল (মাণিকতলা) এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস
এর ছবি। বিমান থেকে তোলা 1931



IN HIS EIGHTY-FIRST YEAR

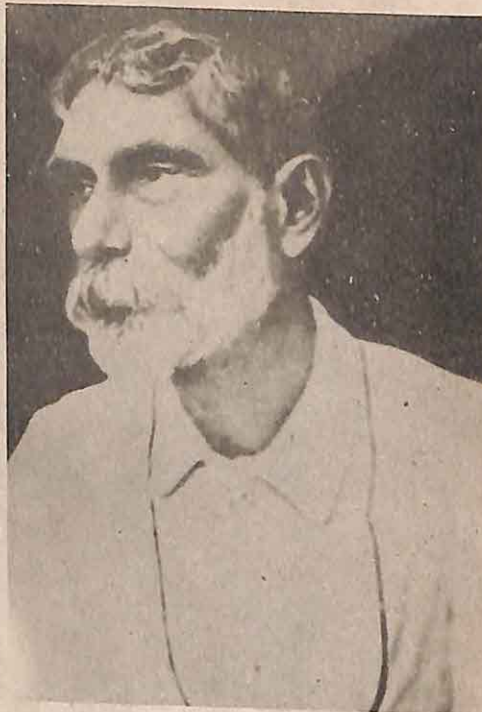
একাশীতম জন্মদিনে প্রফুল্লচন্দ্র

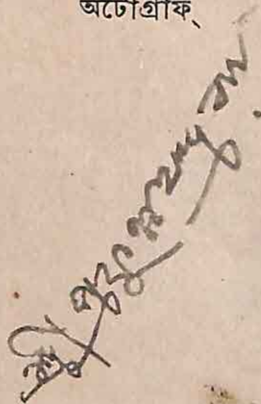


1940 সালে তোলা আরও একটি বিরল আলোকচিত্র।

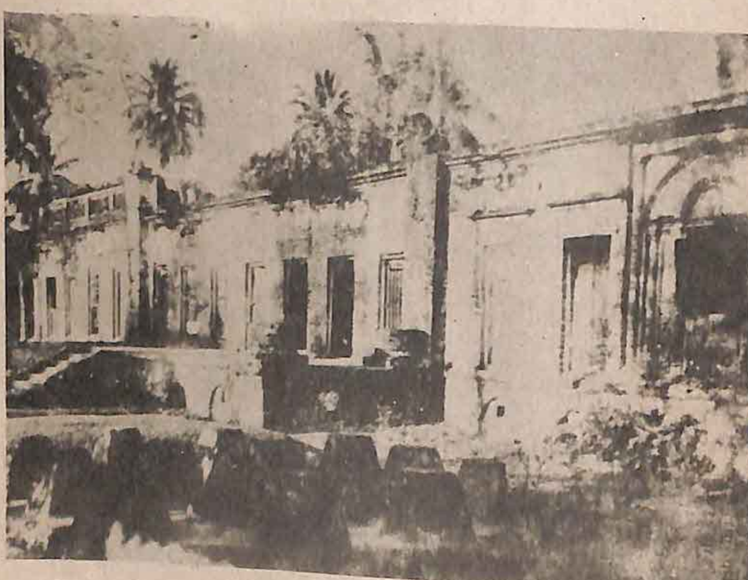
আচার্যদেব ও আচার্যদেবের

অটোগ্রাফ্





আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পৈতৃক ভিটার বাইরের দৃশ্য।



॥ এক ॥

'আমি জন্মেছিলাম সেইকালে যখন বাঙালির ছিল গোলাভরা ধান, দেহ-জোড়া স্বাস্থ্য, গোয়াল-ভরা গরু, পুকুর-ভরা মাছ। কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত সব ছিল বাঙালি। গ্রামে গ্রামে কত বারোয়ারি উৎসব আর বার মাসে তের পার্বণ।'

এই কথা লিখেছেন প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে।

১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট যশোর-খুলনার রাড়ুলি গ্রামে এক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নব্য-ভারতের প্রথম রসায়নবিদ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তখন যশোর-খুলনা (বর্তমান বাংলাদেশ) এক ছিল। এর ওপর দিয়ে প্রবাহিত কপোতাক্ষ নদের এক তীরে সাগড়দাঁড়ি গ্রামে জন্মেছিলেন নব্য-বাংলার প্রথম মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর অপর তীরে রাড়ুলি গ্রামে জন্মেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। নতুন আমলের বাংলার দুই তীর্থ—সাগরদাঁড়ি আর রাড়ুলি। এই দুই ক্ষণজন্মা বাঙালি সন্তানের জন্মকালের মধ্যে ব্যবধান ছিল পঁয়ত্রিশ বছরের। রাড়ুলি ছিল মাইকেলের মামার বাড়ি; সাগরদাঁড়ি থেকে রাড়ুলি আটমাইলের পথ।

প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মের বছরটি আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দুটি

কারণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই একই বছরে জন্মেছিলেন বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ। কবি ও রাসায়নিকের জন্মকালের মধ্যে ব্যবধান মাত্র তিন মাসের। আর এই বছরেই প্রকাশিত হয় মাইকেলের যুগান্তকারী কাব্যগ্রন্থ—মেঘনাদবধ। আবার এই একই বছরে বাংলার আরো কয়েকজন মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যথা, প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার, দেশপ্রেমিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের পিতামহকল্প পুরুষ জলধর সেন ও বিখ্যাত লেখক ও কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার। প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মের বছরটি রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছরেই ক্রুক্স 'থ্যালিয়ম' আবিষ্কার করেন। আবার তাঁর জন্মের মাত্র তিন বছর আগে নিভেছিল সিপাহী যুদ্ধের আগুন, যা জ্বলে উঠেছিল ১৮৫৭ সালে।

'আমার বাবার ছ'হাজার টাকা আয়ের জমিদারি ছিল। কিন্তু তার আগের দুই পুরুষে আমাদের পরিবার যে সম্পত্তি ভোগ করেছেন এই আয় তার তুলনায় সামান্য, কেননা আমার ঠাকুরদা ও ঠাকুরদার বাবা দুজনেই বড় চাকুরি করতেন। আমার ঠাকুরদা আমার মা-কে প্রায় দশ হাজার টাকার গহনা যৌতুক দিয়েছিলেন। আমার বাবার যেসব রূপোর বাসন ছিল, তার দামও কয়েক হাজার টাকা।'

প্রফুল্লচন্দ্রের নিজের এই লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনের কথা বলবার আগে রাড়ুলির যে রায়-পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন এখানে সংক্ষেপে সেই পরিবারের কথা একটু বলছি। বাংলায় হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে আদিশূর নামে একজন রাজা ছিলেন। একবার তিনি একটা যজ্ঞের জন্য কাণ্যকুব্জ থেকে পাঁচটি ব্রাহ্মণ এদেশে নিয়ে আসেন ও তাঁদের প্রত্যেককে জমি-জায়গা দিয়ে বসতি করে দিয়েছিলেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁদের সেবক হিসাবে পাঁচজন কায়স্থও এসেছিলেন। এই পাঁচজন কায়স্থদের মধ্যে দে পদবীধারী

যিনি ছিলেন তিনিই হলেন রায় বংশের আদিপুরুষ। তখন মুসলমান রাজত্ব। ঐ দে বংশের দিগম্বর মানে এক সুসন্তান মুসলমান রাজ সরকারে চাকরি করবার সময় 'রায়চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন। পরে এই উপাধি সংক্ষিপ্ত আকারে হয় 'রায়'।

এই রায় বংশের একজন কপোতাক্ষ নদের তীরে বুরানপুর গ্রামে এসে বসবাস করেন। তখন থেকে গ্রামের নাম হয় রায়ের আলি বা রায়আলি; পরে গ্রামটি রাড়ুলি নামে বিখ্যাত হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের ঠাকুরদার বাবা মাণিকলাল যখন জন্মগ্রহণ করেন সে সময় কোম্পানীর আমল—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন দেশ শাসন করত। প্রত্যেক জেলায় জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব—এই তিনজন ইংরেজ কর্মচারী ভিন্ন আর সবাই দেশীয় কর্মচারী ছিলেন। মাণিকলাল লেখাপড়া শিখে, কোম্পানীর সরকারে দেওয়ানির চাকরি পেয়েছিলেন। তিনি যশোর বা যশোহর জেলায় যখন বদলি হয়ে আসেন তখন নানাভাবে এই স্থানের উন্নতিসাধন করেন।

গ্রামের লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য মাণিকলাল নিজের খরচে একটা দীঘি ও দুটো পুকুর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এই দীঘি মাণিক রায়ের দীঘি নামে বিখ্যাত। মাণিকলালের ছেলে আনন্দলাল কৃতবিদ্য হয়ে যশোর কালেক্টরির অধীনে সেরেস্তাদারের চাকরি পান। তখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব। কোম্পানীর আমলের দেওয়ানীর চাকরিকেই মহারানীর সময়ে সেরেস্তাদার বলা হতো। আনন্দলালও তাঁর বাবার মতো সরকারি চাকরিতে খুব নাম করেছিলেন, পৈতৃক ক্রিয়াকর্ম সব বজায় রেখেছিলেন আর একতলা বাড়িটিকে দোতলায় পরিণত করেন। আনন্দলালের ছেলে হরিশচন্দ্র যেমন বিদ্বান তেমনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, রাড়ুলিতে কোন স্কুল না থাকায় তিনি স্বগ্রামে একটি মধ্য ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। রায়-পরিবারে হরিশচন্দ্রই প্রথম ইংরেজি শিক্ষা করেন। কৃষ্ণনগর কলেজে তিনি রামতনু লাহিড়ীর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতার অকালমৃত্যুর ফলে তিনি

কলেজের শিক্ষা শেষ করতে পারেন নি। তখন তাঁকে পৈতৃক জমিদারি দেখাশুনা করবার জন্য বাড়ি চলে আসতে হয়। হরিশ্চন্দ্র যে পরিবেশের মধ্যে জন্মেছিলেন এবং ছাত্রজীবনে স্বল্পকালের জন্য যাঁদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল, শিক্ষাপ্রচার, জ্ঞানের বিস্তারসাধন ছিল সেই পরিবেশের প্রধান লক্ষণ আর সেইসব মনীষীদের একান্ত কাম্য। তাইতো তিনি অমন বিদ্যোৎসাহী হয়েছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শেও এসেছিলেন।

এই হরিশ্চন্দ্র রায় ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা। তাঁর মা ভুবনমোহিনী নিরক্ষরা ছিলেন; বিদ্যাসাগর তাঁকে বাংলা শিখিয়েছিলেন। মেয়েদের জন্য রাড়ুলিতে হরিশ্চন্দ্র যে স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন সেটি এখন ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত। প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মকালে রাড়ুলির রায়-পরিবার শিক্ষায়, ধনে এবং প্রতিপত্তিতে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। নিজের বংশ-গৌরবের কথা তিনি এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন:

'আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসনকে কেন্দ্র করে যদি চার মাইল ব্যাস নিয়ে একটা বৃত্ত আঁকা যায়, তবে আমাদের বেশির ভাগ জমিদারি এরই মধ্যে পড়ে। এর থেকেই সহজে বোঝা যাবে, আমার বাবা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ জমিদারের মত বেশ সচ্ছলতা ও জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করতে পারতেন। কারণ তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যেই রাজত্ব করতেন। আমাদের সদর দরজায় মোটা বাঁশের লাঠিধারী ছয়জন পাঠক বরকন্দাজ থাকত। আমার বাবা কাছারি বাড়িতে সকাল আটটা থেকে দুপুর পর্যন্ত বসতেন। ঐ কাছারি যেন গম্‌গম্ করত। কাছারিতে রীতিমত মামলা মোকদ্দমার বিচার হতো।'

হরিশ্চন্দ্রের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা; ছোট ছেলেটি অকালে মারা যায়। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিভা ও চরিত্রে শুধু রায়-বংশের মুখ উজ্জ্বল করেননি—

বাংলা তথা সমগ্র ভারতের তিনি মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। ন' বছর বয়স পর্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র নিজ গ্রামের মাইনর স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। এই স্কুল তাঁর বাবা স্থাপন করেছিলেন। ১৮৭০ সালে তিনি কলকাতায় পড়তে এলেন। প্রথম কলকাতায় আসার স্মৃতি এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

'১৮৭০ সালে আমি প্রথম কলকাতায় আসি। তখন আমার মনে যে ভাব জেগেছিল, তার স্মৃতি এখনও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। আমার বাবা ঝামাপুকুর লেন ও রাজা দিগম্বর মিত্তিরের বাড়ির উল্টোদিকে একটা বাড়ি ভাড়া করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে পৃথক হয়ে কেশবচন্দ্র সেন তখন সবে মাত্র তাঁর নতুন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের বাসা ঐ সমাজের খুব কাছে ছিল। আমি আগস্ট মাস খুব আনন্দে কলকাতায় কাটালাম। প্রায় প্রত্যহই নতুন নতুন দৃশ্য দেখতাম। আমার চোখের সামনে এক নতুন জগতের দৃশ্য দেখা দিল। তখন নতুন জলের কল কেবল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর শহরের লোক কলের জল ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। গোঁড়া হিন্দুরা ঐ জল ব্যবহার করতে তখনো সংকোচ বোধ করতেন। মাটির নিচে ড্রেন তৈরির কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে।'

কলকাতায় এসে, অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আকৃতিতে বাঘের মতো ছিলেন তিনি, ছেলেরা তাই তাঁর নাম দিয়েছিল 'বাঘাচণ্ডী'।

॥ দুই ॥

লেখাপড়ায় বালক প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁর স্কুল জীবনের কথা তিনি এইভাবে লিখেছেন: 'আমার পড়াশুনার বেশ অভ্যাস ছিল। স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তকে আমার জ্ঞান-তৃষা মিটত না। বই পড়ার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল। আমার যখন বয়স মাত্র বার বছর সেই সময়ে আমি শেষ রাতে তিনটা-চারটার সময় উঠে কোন প্রিয় লেখকের বই নির্জনে বসে পড়তাম। ইতিহাস ও জীবনচরিত আমার খুব প্রিয় ছিল।'

বস্তুত লেখাপড়াকে তিনি তপস্যার তুল্য মনে করতেন। আজীবন তিনি ছিলেন জ্ঞানতপস্বী। একালের ছেলেরা লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী নয় দেখে, প্রফুল্লচন্দ্র দুঃখ করে বলতেন: 'আমাদের সময়ে ছাত্রেরা খুব খাটত এবং সেই পরিশ্রমে তারা আনন্দবোধ করত। এখনকার ছেলেরা দেখি মানে বই দেখে পড়ে, পাঠ্যপুস্তক মন দিয়ে পড়ে না, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যদি কিছু পড়ে তা নাটক-নভেল।'

প্রফুল্লচন্দ্র যখন কলকাতায় পড়তে এলেন তখন বাংলায় কেশবচন্দ্র সেনের যুগ। সেদিনের বাংলায় এঁরই প্রভাব ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের

দেশের বাড়িতে একটা লাইব্রেরি ছিল—এটা হরিশ্চন্দ্র করেছিলেন। সেই পারিবারিক গ্রন্থাগারে ছিল কত ভাল ভাল বই আর নানা রকম পত্র-পত্রিকা। তখনকার দিনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই ছিল শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকাটি স্থাপন করেছিলেন; অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এর সম্পাদক। বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি তখনকার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই কাগজে লিখতেন। কেশব-চন্দ্রের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকাও তাঁদের বাড়িতে আসত ও তার বাঁধানো ফাইল বাড়ির লাইব্রেরিতে ছিল। বালক বয়সে এই কলকাতায় এসে দুটি পত্রিকা পাঠ করে ও কলকাতায় কেশবসেনের বক্তৃতা শুনে প্রফুল্লচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রায়-পরিবারে তিনিই প্রথম ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

হেয়ার স্কুলে প্রফুল্লচন্দ্র বেশিদিন পড়তে পারেন নি। তিনি যখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁর খুব রক্ত আমাশয় অসুখ হয়। এই অসুখে তিনি সাতমাস ভুগেছিলেন এবং তাঁর হজম শক্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। অগত্যা তাঁর স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। যে দু'বছর তাঁর পড়াশুনা বন্ধ ছিল, ঐ সময়টা তিনি বৃথা যেতে দেন নি। বাবার লাইব্রেরিতে তখন এসেছে দেশী-বিদেশী আরো অনেক বই। লেথব্রিজের আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের সংকলন বইটা তিনি এই সময়ে খুব যত্নের সঙ্গে পড়েছিলেন। আর পড়েছিলেন 'বঙ্গদর্শন', 'আর্যদর্শন,' 'সোম প্রকাশ' 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্র-পত্রিকাগুলি। 'ইণ্ডিয়ান মিরার'ই তখন ভারতীয় কর্তৃত্বে পরিচালিত একমাত্র ইংরেজি দৈনিক। এইসব পড়ার দরুন তাঁর জ্ঞানের পরিধি ঐ বয়সে যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল।

দু'বছর পরে প্রফুল্লচন্দ্র সুস্থ হয়ে কলকাতায় এলেন ও ভর্তি হলেন অ্যালবার্ট স্কুলে। এই স্কুলটা করেছিলেন কেশব সেন; স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলটি বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। কেশব সেনের ছোট ভাই কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন এই স্কুলের প্রধান

শিক্ষক। কৃষ্ণবিহারী 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজটিরও সম্পাদক ছিলেন। এই স্কুলে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর মনের মতো পরিবেশ পেয়েছিলেন। এখানকার শিক্ষকেরা সবাই ব্রাহ্মসমাজের লোক ছিলেন; তাঁদের সংস্পর্শে এসে প্রফুল্লচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই স্কুলে ভর্তি হবার পর ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র প্রফুল্লচন্দ্রই শিক্ষকদের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করলেন। কারণ তাঁর মাস্টাররা অল্পদিনেই বুঝতে পারলেন যে, এই লাজুক ও রুগ্ন-শরীর ছাত্রটি তার সহপাঠীদের চেয়ে অনেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। অ্যালবার্ট স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবন সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন: 'অ্যালবার্ট স্কুলে আমাদের শিক্ষকেরা শান্ত ও মধুর প্রকৃতির ছিলেন। কৃষ্ণবিহারী সেন স্কুলের রেক্টর ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন—ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর খুব দখল ছিল। তাঁর শিক্ষকতায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পেল। যথাসময়ে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। আমার মাস্টার মশাইদের আমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা ছিল। তাঁরা আমার পরীক্ষার ফল দেখে একটু নিরাশ হলেন। বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় আমার নাম ছিল না।'

মাস্টার মশাইরা নিরাশ হলেও ছাত্রটি কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেশ শান্তভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্র হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র যেমন মেধাবী তেমনি অধ্যয়নশীল ছিলেন। পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখালেই ছাত্র যে ভাল হয় প্রফুল্লচন্দ্র এই মতবাদে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। এ ছিল তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।

স্কুলের পড়া শেষ হলো। এবার প্রফুল্লচন্দ্র ভর্তি হলেন বিদ্যা-সাগরের মেট্রোপলিটান কলেজে; তাঁর অগ্রজ পড়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। মেট্রোপলিটানে কলেজ বিভাগ তখন নতুন খোলা হয়েছে; মাইনে মাত্র তিন টাকা আর ভাল ভাল অধ্যাপক ছিলেন এখানে। তিনি এফ. এ. (First Arts) ক্লাসে ভর্তি হলেন। তখন এফ. এ -র পাঠক্রমের মধ্যে রসায়ন (Chemistry) অবশ্য পাঠ্য ছিল।

মেট্রোপলিটানে এই বিষয়টি পড়াবার ব্যবস্থা তখন ছিল না। কাজেই প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাইরের ছাত্র হিসাবে রসায়নের পাঠ গ্রহণ করতে হতো। পেডলার সাহেব তখন এখানে রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। খুব নাম করা অধ্যাপক। এঁর অধ্যাপনার ফলেই প্রফুল্লচন্দ্র রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কলেজ-জীবনের একটা ঘটনা এখানে বলছি। প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন: 'একবার ক্লাসে এক্সপেরিমেন্ট দেখে সন্তুষ্ট না হয়ে, আমি এবং আমার একজন সহাধ্যায়ী বাড়িতে একটা ছোট ল্যাবোরেটরি স্থাপন করলাম। আমরা টিনের পাত দিয়ে একটা শুক্‌নো হাইড্রোজেন ব্লো-পাইপ তৈরি করেছিলাম। এই যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে একদিন ওটা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আহত হইনি।'

এফ. এ. ক্লাসেই প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নের নির্দিষ্ট পাঠ্য বই ছাড়া যতদূর সম্ভব আরো অনেকগুলো রসায়নবিদ্যার বই পড়েছিলেন। তাঁর এই অধ্যয়নস্পৃহা দেখে তাঁর অধ্যাপক পেডলার সাহেব একবার প্রফুল্লচন্দ্রকে বলেছিলেন: 'One day you will be a great chemist, my son' তাঁর অধ্যাপকের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল। যদিও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল তবু এফ. এ. পড়বার সময় প্রফুল্ল-চন্দ্রকে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হলো। 'আমি সাহিত্যের মায়া কাটিয়ে বিজ্ঞানেরই আনুগত্য স্বীকার করলাম এবং ক্রমে বিজ্ঞানের একজন একনিষ্ঠ সেবক হলাম।'

যথাসময়ে তিনি এফ. এ. পাশ করলেন। তিনি বি.এ.-তে 'বি' কোর্স নিয়ে ভর্তি হলেন। যারা বিজ্ঞান পড়তো তারা 'বি' কোর্স নিত। তবে বি. এ-তে তখন ইংরেজি অবশ্য পাঠ্য ছিল। হরিশ্চন্দ্রের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর একটি ছেলে বিলেতে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে নানারকম আর্থিক গোলযোগে পড়ায় তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বাবার মনের এই অভিলাষ

প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। অতঃপর তিনি নিজের চেষ্টাতেই উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়ার উপায় করেন। কি উপায় করেছিলেন, জানো ? তিনি একটা বিলাতি বৃত্তি পেয়ে তাঁর যাবার সাধ পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর ছাত্রজীবনের সেই ঘটনাটি এখানে বলি।

ইংলণ্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হতো—এর নাম 'গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ'। পৃথিবীর সকল দেশের ছাত্রই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা বৃত্তি লাভ করতে পারতো। এর পরীক্ষা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই গৃহীত হয় এবং ফলাফল সেখান থেকেই প্রকাশিত হয়। এই পরীক্ষা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার সমান ছিল আর এ পাশ করতে হলে লাতিন, গ্রীক অথবা সংস্কৃত, ফরাসী বা জার্মান ভাষা জানতে হতো। প্রফুল্লচন্দ্র বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েই গোপনে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর বড়দাদা ছাড়া আর কেউ এটা জানত না। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল কলকাতার স্টেটসম্যান কাগজে বেরুলো। দেখা গেল ভারতবর্ষে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় দুজন ছাত্র পাশ করেছে—বোম্বাই থেকে একজন পার্শী ছাত্র আর কলকাতায় প্রফুল্লচন্দ্র। বাঙালির মধ্যে তিনিই প্রথম গিলক্রাইস্ট স্কলার।

কলেজে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দেরী হলো না। সেদিন তিনি কলেজে যাওয়া মাত্র অধ্যক্ষ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি প্রফুল্ল-চন্দ্রকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে লেখা হলো : 'প্রফুল্লচন্দ্র রায় মেট্রোপলিটান কলেজের জন্য নতুন কীর্তি অর্জন করলেন। বাঙালি তরুণের এই সাফল্যে বাঙালি মাত্রেই গর্ববোধ করবে।' তারপর একদিন বৃত্তির সামান্য টাকার ওপর নির্ভর করে, উৎসাহী প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বাবার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে সমুদ্রযাত্রা শুরু করলেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন দ্বারকানাথ রায়। ১৮৮২ সালে তিনি যখন বিলাত যাত্রা করেন,

তখন বাঙালিদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য খুব বেশি ছাত্র বিলাত যায় নি। জগদীশচন্দ্র ১৮৮০ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য লণ্ডনে যান। এর ঠিক দু'বছর বাদে এই দুই তরুণ ভারতীয় হাজির লণ্ডনে। এদের স্বাগত জানাতে জগদীশচন্দ্র লণ্ডনের ফেনচার্চ স্ট্রিট স্টেশনে হাজির ছিলেন। সম্ভবত এর পর থেকেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সূচনা হয়। কেমব্রিজে ভর্তি হওয়ার দু'বছর পরে প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন।

লণ্ডন থেকে চার শো মাইল দূরে এডিনবার্গ শহর। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় অনেকদিন থেকেই য়ুরোপের অন্যতম বিদ্যাপীঠরূপে বিখ্যাত। এক সপ্তাহ লণ্ডনে থাকার পর প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবার্গ এলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এডিনবার্গ সুন্দর শহর বলে মনে হলো। লণ্ডনের আকাশ যেমন কুয়াশায় ঢাকা, এখানে তেমন নয়। এখানকার চারদিকেই সুন্দর দৃশ্য। শীতের সেশনের প্রথমভাগেই তিনি ভর্তি হলেন এবং প্রাথমিক বি. এস-সি. পরীক্ষার জন্য রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করতে লাগলেন। তবে খুব শীঘ্র তিনি বুঝতে পারলেন যে, রসায়নই তাঁর মনের মতো বিষয়। অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার ক্রামব্রাউনের কাছে তিনি এই বিষয়ে পাঠ নিতে লাগলেন। থাকবার জন্য সপ্তাহে বারো শিলিং ছয় পেন্স ভাড়ায় তিনি দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। এডিনবার্গে পড়বার সময়ে তিনি খুব মিতব্যয়ীভাবে চলতেন। বৃত্তির টাকা ছাড়া বাড়ি থেকে তিনি মাঝে মাঝে কিছু টাকা পেতেন। ছাত্রজীবনে প্রফুল্লচন্দ্র বিলাসিতার ধার দিয়েও যেতেন না। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দু'বছর পড়েছিলেন।

॥ তিন ॥

১৮৮৬ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এস.-সি. পরীক্ষায় পাশ করে, প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' উপাধির জন্য গবেষণা শুরু করে দিলেন। তাঁর একনিষ্ঠ সাধনার পুরস্কার মিলল। ১৮৮৭ সালে তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি. এস.-সি. উপাধি লাভ করে ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করলেন। এখানে জেনে রাখো, তাঁর আগে প্রথম যে বাঙালি সন্তান এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই উপাধিতে বিভূষিত হয়েছিলেন তিনি হলেন স্বনামধন্যা দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডুর বাবা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রফুল্লচন্দ্র শুধু ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন নি, তাঁর গবেষণা-প্রবন্ধ (Thesis) খুব ভালো হওয়ার দরুন তিনি 'হোপ' প্রাইজও পেয়েছিলেন। গিল-ক্রাইস্ট স্কলারশিপের নির্দিষ্ট টাকার ওপর তাঁকে আরো পঞ্চাশ পাউণ্ড টাকা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কৃতিত্বের জন্য আরো একটি সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন ; ক্ষীণস্বাস্থ্যের এই বাঙালি ছাত্রটি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র অ-জৈব রসায়নে (Inorganic Chemistry) ডক্টরেট পেয়েছিলেন। এইবার তিনি জৈব রসায়ন (Organic Chemistry) সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে লাগলেন। তখন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

সবেমাত্র এই বিষয়ের চর্চা আরম্ভ হয়েছে। ১৮৮৮ সালে সেশন শেষ হলো। এইবার তিনি দেশে ফিরবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। ফিরবার আগে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনী সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। টনী সাহেব তখন ছুটি নিয়ে বিলাত এসেছেন। তিনি বাংলার শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রফটের কাছে একটি পরিচয় পত্র লিখে দিলেন। এই চিঠিখানি সঙ্গে নিয়ে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত যুবক প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশে যাত্রা করলেন।

তিনি যখন দেশে ফিরলেন, হরিশ্চন্দ্রের আর্থিক অবস্থা তখন আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়েছে। বড় ভাই তখন ডায়মণ্ড-হারবারে থেকে ওকালতি ব্যবসায় করছেন। টনী সাহেবের সুপারিশ সত্ত্বেও চাকরি পেতে প্রফুল্লচন্দ্রকে বেশ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হলো। শিক্ষাবিভাগে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের চাকরি তিনি আশা করেছিলেন। তিনি ক্রফট সাহেব ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যতম অধ্যাপক পেডলারের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। এমন কি দার্জিলিঙ-এ গিয়ে ছোটলাটের সঙ্গেও সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর প্রফুল্লচন্দ্রকে পুরো একটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন শিক্ষাবিভাগে দুই শ্রেণীর চাকরি প্রচলিত ছিল—ইম্পিরিয়াল ও প্রভিনসিয়াল; প্রথম শ্রেণীর চাকরি ইংরেজদের জন্য আর দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকরি দেশীয় লোকদের অর্থাৎ ভারতীয়দের জন্য। গায়ের রঙের কাছে সত্যিকার যোগ্যতা গণ্য করাই হতো না। এই ছিল পরাধীন দেশের অভিশাপ। তাই দেখা যায় যে, যোগ্যতা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের মতো কৃতী ব্যক্তি সেদিন সহজে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করতে পারেন নি।

জীবনের এই দুর্দিনে প্রফুল্লচন্দ্র প্রায়ই জগদীশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করতেন। বিলাতে ছাত্রাবস্থাতেই দুজনের মধ্যে

S.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date 16.5.06
Accn No 12175
S.C.E.R.T. West Bengal Library

আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। দেশে ফিরে যে এক বছর কাল তিনি বসেছিলেন, সেই সময়টা বসু-জায়ার স্নেহে ও যত্নে প্রফুল্লচন্দ্রের দিনগুলো সুখে অতিবাহিত হয়েছিল একথা প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই বলেছেন। পরবর্তী সময়েও প্রফুল্লচন্দ্র প্রায় সব সময়ই থেকেছেন বসুদম্পতির কাছাকাছি। প্রায় রোজই হাজির হতেন জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে। তবে দেখা যেত জগদীশচন্দ্রকে তিনি কিছুটা এড়িয়ে চলতেন। কারণ জগদীশচন্দ্র বন্ধুর শরীর ও খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে উদাসীনতা মোটেই পছন্দ করতেন না। প্রফুল্লচন্দ্রের যত কিছু কথা বা আব্দার সবই চলতো শ্রীমতী অবলা বসুর সঙ্গে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উদাসীনতার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসু পরবর্তীকালে বলেছিলেন, একদিন সন্ধ্যার সময় দেখা গেল রাত্রের খাবারের কোন ব্যবস্থা তাঁদের (প্রফুল্লচন্দ্র ও ছাত্রদের) করা হয় নি। আচার্যদেব জ্ঞান রায়কে (ডক্টর জে. এন. রায়) বললেন চুপি চুপি লেডি বসুর রান্না ঘরে চলে যেতে আর রান্নার লোকটিকে জিজ্ঞাসা করতে—বাড়তি খাবার কিছু আছে কিনা। রান্নাঘরে কথাবার্তা শুনে শ্রীমতী বসু এসে জ্ঞান রায়ের কাছ থেকে সব জানেন। তিনি তখনই কিছু খাবার তৈরি করিয়ে পাঠিয়ে দেন তাঁদের। পরের দিন আচার্য রায়ের কাছে গিয়ে শ্রীমতী বসু খানিকটা উপদেশ দিয়ে এলেন আর ঠিক করে এলেন যে কিছুদিন তাঁর বাড়ি থেকেই সবার খাবার যাবে আচার্যদেবের কাছে।

অবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের জন্য একটা সহকারী পদ মঞ্জুর হলো। মাইনে দুশো পঞ্চাশ টাকা। সেই সামান্য বেতনেই প্রফুল্লচন্দ্রকে অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হলো। বলা বাহুল্য, তিনি এতে সন্তুষ্ট হলেন না। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট তিনি, তবু সরকার তাঁর কোন মূল্যই দিলেন না—এই অবিচারে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন, ঠিক যেমন হয়েছিলেন একদিন তাঁর বন্ধু জগদীশচন্দ্র। নিয়োগ-পত্র পাওয়ার পর প্রফুল্লচন্দ্র দার্জিলিঙ-

এ গিয়ে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা ক্রফট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন।

—আমার প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

—অবিচার! কেমন করে আপনার মনে এই ধারণা হলো?

—আমি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি।

—তা আমি জানি।

—যদি আমার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ইংরেজ অধ্যাপককে আনতে হতো, তবে তাঁকে একেবারে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে আপনারা নিয়োগ করতেন।

—আপনার যদি পছন্দ না হয় তবে আপনি অন্য চাকরি করতে পারেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি ফিরে এলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের একজন সহকারী অধ্যাপক। আরম্ভ হলো তাঁর গৌরবময় শিক্ষক-জীবন। ১৮৮৯ সালে সেশনের প্রথমেই তিনি কাজে যোগদান করলেন। তখন এই বিভাগে ছিলেন পেডলার ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী ও আরো দুজন সহকারী। পেডলার ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। অধ্যাপক হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র অল্পদিনেই ছাত্রদের কাছে সুনাম অর্জন করলেন। পুজোর ছুটিতে পেডলার সাহেব বিলাত গেলে রসায়ন বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়েছিল। আচার্যদেব এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'এক হিসাবে আমার শিক্ষক-জীবনের সবচেয়ে কার্যবহুল সময় এটাই ছিল। কখনো আমাকে পর পর তিনটি ক্লাস নিতে হতো, ল্যাবোরেটরিতে ছাত্রদের কাজের তত্ত্বাবধান করতে হতো। কিন্তু কাজেই ছিল আমার আনন্দ এবং যেহেতু কাজে আমি এক নতুন আনন্দ বোধ করতাম, সেইজন্য এই গুরুভার বহন করতে আমার কোন ক্লান্তি হতো না।

অধ্যাপনার অবসরে প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণার দিকে মন দিলেন।

কিন্তু গবেষণা যে করবেন সেজন্য ভাল ল্যাবোরেটরি কোথায়? প্রেসিডেন্সি কলেজে তখনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ছিল না বললেই হয়। উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবে ইচ্ছামত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার বা মৌলিক গবেষণার কোন সুবিধা ছিল না। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রথম প্রথম এই অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। তবে এঁদের কেউই সেজন্য নিরুৎসাহ বোধ করেন নি।

প্রফুল্লচন্দ্রের প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল ঘি আর সরষের তেল। বাঙালির খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে এই দুটিই স্নেহ পদার্থ। তিনি দেখলেন, বাজারে ঘি ও তেল বলে যা বিক্রী হয়, তা খাঁটি নয়। এই সব জিনিসে ভেজাল কতটা পরিমাণে আছে তাই তিনি রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণয় করতে চাইলেন। এই কাজ হাতে নিয়ে তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি এই কাজে তিন বছর পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাঁর গবেষণার ফলাফল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৯৫।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর।

পৃথিবীর রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসেও এটি একটি স্মরণীয় বৎসর। তাঁর গবেষণার ফলে এই বছরে আবিষ্কৃত হয় মার্কিউরাস নাইট্রাইট। সেদিন বিশ্বের বিজ্ঞান জগতে একজন অজ্ঞাতনামা বাঙালি বৈজ্ঞানিকের এই আবিষ্ক্রিয়া যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তা আজ এতকাল বাদে আমরা সঠিক ধারণা করতে পারব না। এর ঠিক তিন বছর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের কেমিক্যাল ল্যাবোরেটরিটি প্রফুল্লচন্দ্রের সুপারিশক্রমে নতুনভাবে তৈরি করা হয়। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন গবেষণাগারের প্ল্যান থেকে কিছু কিছু নিয়ে বেশ সুন্দর সুসজ্জিত ও আলো-বাতাসযুক্ত একটি গবেষণাগার তৈরি হলো রসায়ন বিভাগের ছাত্রদের জন্য। ১৮৯৪ সালে নতুন

ল্যাবোরেটরি তৈরির কাজ শেষ হয়। বিলাত থেকে এলো কত রকমের নতুন সাজ-সরঞ্জাম।

নতুন পরিবেশে নতুন গবেষণাগার হলো। তখন থেকেই রাসায়নিক গবেষণা কাজে প্রফুল্লচন্দ্র নতুন শক্তি ও উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন। এরই পরিণতি মার্কিউরাস নাইট্রাইট। প্রথমে তিনি কয়েকটি দুর্লভ ভারতীয় ধাতু বিশ্লেষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সেই গবেষণা কাজে কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। পারদঘটিত একটা নতুন যৌগিক পদার্থ তিনি আবিষ্কার করলেন। তাঁর সেই চমকপ্রদ আবিষ্ক্রিয়ার কাহিনী রাসায়নিক নিজে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

'মার্কিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করার পর আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হলো। একদিন ল্যাবোরেটরিতে পারদের (Mercury) ওপর অ্যাসিডের ক্রিয়ার দ্বারা মার্কিউরাস নাইট্রাইট তৈরি করতে গিয়ে আমি কাচের পাত্রটির নিচে হলদে রঙের দানা (crystal) পড়তে দেখে একটু অবাক হলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল এ কোন basic salt ; কিন্তু ঐ রকম প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ শ্রেণীর সল্টের উৎপত্তি সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে। যাই হোক প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো যে এটা 'মার্কিউরাস সল্ট ও নাইট্রাইট-দুইই।' জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারও ছিল এই বছরের ঘটনা।

যাঁরা বিজ্ঞান জগতে আবিষ্কারকের গৌরব লাভ করেছেন তাঁদের জীবনে একটা আশ্চর্য জিনিস এই দেখা যায় যে, আবিষ্কারের বিষয় যেন তাঁদের নেশার মতো পেয়ে বসে এবং অনেক সময় তাঁরা আহার নিদ্রা পর্যন্ত ভুলে যান। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। অতঃপর তিনি এই মিশ্রপদার্থ নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু করে দিলেন। বিজ্ঞানের নবতত্ত্বের অন্বেষণে তাঁর সাধনার বিরাম ছিল না। তরল নাইট্রিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে পারার গায়ে হলদে রঙের ছোপ অনেকেই এর আগে লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে যে কি রহস্য রয়েছে তা বুঝবার জন্য সেদিন প্রফুল্লচন্দ্রের মতো একটা

প্রতিভার দরকার ছিল। সেই নয়নলোভন হলদে রঙ তাঁর কাছে একটা নতুন পদার্থসৃষ্টির আভাস দিল। ঠাণ্ডা অবস্থায় ঐ অ্যাসিড প্রয়োগ করে পারা (Mercury) থেকে তিনি হলদে রঙের মার্কিউ-রাস নাইট্রাইট (Mercurous Nitrate) তৈরি করলেন, পাশ্চাত্যের বিখ্যাত রাসায়নিকমণ্ডলী বাঙালি রাসায়নিকের এই গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করলেন। তাঁরা একবাক্যে বললেন—এতদিন বাদে পারা থেকে তৈরি যৌগিক (Compound) পদার্থসমূহের একটা শূন্যস্থান পূর্ণ হলো।

তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের বিষয় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হওয়া মাত্র য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশের বিখ্যাত রাসায়নিকগণ প্রফুল্লচন্দ্রের এই গবেষণা ও গবেষণালব্ধ তত্ত্বের প্রশংসা করলেন। এইভাবে শতাব্দীর শেষপাদে এসে ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ওদেশে স্বীকৃত হলো যে-দুজন বাঙালির সাধনার ফলে তাঁরা হলেন জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র। প্রফুল্লচন্দ্রের এই আবিষ্কার সেদিন বিশ্বের বিদগ্ধ সভায় ভারতকে আচার্যের বেদীতে বসিয়েছিল।

অতঃপর একটির পর একটি নতুন মিশ্র পদার্থ তিনি আবিষ্কার করতে লাগলেন। তাঁর জীবনে তখনকার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন : 'নব্যরসায়নী বিদ্যার অন্যতম প্রবর্তক শীলির (Scheele) ভাষায় আমিও বলতে পারতম : একটি আবিক্রিয়া থেকে মনের মধ্যে যে আনন্দ উদ্ভূত হয় তার তুল্য আনন্দ আর নেই ; এই আনন্দ হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তোলে। এই নবোন্মুক্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিচরণ করা ও তার অজ্ঞাত স্থানসমূহ আবিষ্কার করা এর ফলে প্রতিমুহূর্তে মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হতো।'

অধ্যাপনা ও গবেষণা—প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রফুল্লচন্দ্র এই দুটো কাজই করতেন। তিনি শুধু অধ্যাপনা নিয়ে থাকতেন না, বাংলার

ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান অনুশীলনের আগ্রহ সৃষ্টি করবার জন্য তখন থেকেই তিনি চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। প্রাণিবিজ্ঞান (Biology) অনুশীলন করবার জন্য তিনি 'নেচার ক্লাব' নাম দিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক সমিতি পর্যন্ত গঠন করেছিলেন। তখনকার অনেক নমা-করা লোক, যেমন—ডাক্তার নীলরতন সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, প্রাণিতত্ত্ববিদ রামব্রহ্ম সান্যাল, রামানন্দ চট্টোপাধায়, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, ডাক্তার বিপিন বিহারী সরকার ও অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি ঐ ক্লাবের সদস্য ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র এই ক্লাবে প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি 'সরল প্রাণিবিজ্ঞান' নাম দিয়ে একখানা বইও লিখেছিলেন।

বৈজ্ঞানিকের জীবন কঠোর পরিশ্রমের জীবন, নিরলস সাধনার জীবন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র। দুজনেরই আবিষ্কার বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সভায় সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন শিক্ষাবিভাগ এঁদের কাউকেই গবেষণার কৃতিত্বের জন্য সাহায্য করা দূরে থাক, উৎসাহ পর্যন্ত দিতে দ্বিধা করেছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ প্রতিভা বলেই বিশ্বের বিদ্বৎসভায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা তাঁরা কোনদিনই নিজেদের জন্য চাননি—চেয়েছিলেন সমস্ত দেশবাসীর হয়ে। ভারতবাসীরা যে স্বপ্নবিলাসী ও দর্শনপ্রিয় নয়, তারাও যে বিজ্ঞানজগতে কিছু দান করতে পারে—এই সত্যটাই সেদিন—বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে—প্রমাণ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র।

যে সময় প্রফুল্লচন্দ্র মার্কিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করেন সেই একই সময়ে তিনি সকলের অগোচরে আর একটা বড়ো কাজে হাত দিয়েছিলেন। সেটা হলো হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস রচনা। বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে একজন তথ্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিক ছিল। ইতিহাস তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তাঁর জীবনের দীর্ঘকাল ইতিহাস আলোচনায় কেটেছে। প্রফুল্লচন্দ্র যখন স্কুলের

ছাত্র তখন বাংলায় চলেছে 'বঙ্গদর্শন'-এর যুগ। আত্মবিস্মৃত জাতির অতীত জানবার এবং তা জেনে, ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয় কথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম লেখেন। প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রজীবনে এইসব লেখা গভীর রেখাপাত করে থাকবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি যখন হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন একবার দুরন্ত আমাশায় রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বৎসর ভুগি। সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। এই দুই বৎসর বাধ্য হইয়া আমাকে বাড়িতে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এই সময়ে ল্যাটিন, ফরাসী ইত্যাদি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি। বঙ্গদর্শনে রামদাস সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে প্রত্নতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধ লিখিতেন আমি তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সেই অল্প বয়সে আমার মনে ঐ যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহ হইয়াছিল তাহা বহুকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় গুপ্ত থাকিয়া হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস লিখিবার সময় পুনর্বার প্রকাশিত হয়।"

১৯০২।

প্রকাশিত হলো প্রফুল্লচন্দ্রের যুগান্তকারী গ্রন্থ: A History of Hindu Chemistry ('হিন্দু রসায়ন শাস্ত্র'); আধুনিক ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসেও এটা একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। এই একখানা বই লিখে প্রফুল্লচন্দ্র একদিকে যেমন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। হাতে লেখা পোকায় কাটা প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে তিনি এই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এই বই লিখবার জন্য তাঁকে বারো বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বইটির প্রথম খণ্ড বেরুবার ছয় বছর পরে প্রকাশিত হয় এর দ্বিতীয় খণ্ড। অকৃতদার বৈজ্ঞানিক তাঁর এই বইটির সকল স্বত্ব ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটিকে দিয়ে গেছেন। এ বড় কম উদারতার পরিচায়ক ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে, দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপারে শিক্ষাবিভাগের

অধিকর্তা পেডলার সাহেব তাঁকে সরকারিভাবে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।

বইটির ভূমিকায় প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন :

'জগতের প্রধান জাতিরা রসায়ন শাস্ত্রে কতখানি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল এ জানবার জন্য প্রথম থেকেই আমার আগ্রহ ছিল অসীম। আমি বারো বছর ধরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের লেখা রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসের বইগুলো খুব ভালো করে পড়েছি। এগুলো পড়তে পড়তে রসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় প্রাচীন ভারতের স্থান কোথায়. এ আমি অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছি। এই অনুসন্ধানে আমি যখন ব্যস্ত তখন ১৮৯৭ সালে রসায়ন বিজ্ঞানের তৎকালীন আচার্য ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে বার্থেলোর সঙ্গে আমার পত্রালাপ হয়। (সংশ্লেষিক রসায়নে অর্থাৎ সিনথেটিক্যাল কেমেস্ট্রিতে পৃথিবীতে এঁর তুল্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কেউ জন্মায় নি।) আমাদের দু-জনার এই যোগযোগ আলোচনার ধারায় একটা নতুন গতির সঞ্চার করলো। বার্থেলো ছিলেন প্রাচীন য়ুরোপের রসায়নচর্চার ইতিহাস সম্বন্ধে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। এক চিঠিতে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন—রসায়নে প্রাচীন হিন্দুদের দান কতটুকু? এই প্রশ্নটি আমার পরিকল্পিত কাজে উৎসাহ সঞ্চার করেছিল।'

সালটা সম্ভবত ১৮৯৮। মসিয়ে বার্থেলোর এই প্রশ্নকে সামনে রেখে প্রফুল্লচন্দ্র "রাসেন্দ্র সার-সংগ্রহ" নামে একটি পুরোনো বইয়ের সারমর্মকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের ওপর একটি প্রবন্ধ লেখেন। বার্থেলো তাঁকে এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত 'মধ্যযুগের রসায়নের ইতিহাস' বইটি তিনখণ্ড উপহার দিয়েছিলেন। তিনি বইটি খুব যত্নের সঙ্গে পাঠ করেন। পড়তে পড়তে হিন্দু রসায়ন সম্বন্ধে ঐরকম একটি বই লিখতে তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মায়। তিনি অন্যত্র এ বিষয়ে বলেছিলেন, পৃথিবীর নানা প্রাচীন জাতি রসায়ন শাস্ত্রে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছিলেন তা জানায় কৌতূহল আমার

ছিল। আমি যখন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন থেকে টমসন, কপ প্রভৃতি মনীষিগণের বিখাত গ্রন্থ আমার প্রিয় ছিল। সে সময় প্রাচীন ভারতীয়রা রসায়নশাস্ত্রে কতটা উন্নতি করেছিলেন, তা জানবার জন্য আমার মনে অনুসন্ধানের স্পৃহা জেগে ওঠে। এ জন্য আমি 'চরক' 'সুশ্রুত' প্রভৃতি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো (যেগুলো অবলুপ্ত হয়নি) নিয়ে অনুসন্ধানে লিপ্ত হই। রসায়নের গবেষণা ছেড়ে এখন তিনি ইতিহাসের রাজ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, বার্থেলোর বই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। এই গ্রন্থটি রচনা করতে প্রফুল্লচন্দ্রকে বহু পুরনো পুঁথি পড়তে হয়েছিল। এইসব পুঁথি তিনি অনেক কষ্ট করে যোগাড় করেছিলেন মাদ্রাজ, বারাণসী, কাটমুণ্ডু, তিব্বত, তাঞ্জোর প্রভৃতি জায়গা থেকে। তিনি প্রাচীন ভারতের রসায়ন চর্চার যুগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথম যুগ হচ্ছে বুদ্ধদেবের সময়ের আগে থেকে ৮০০ খ্রীস্টাব্দ। এ যুগে রচিত হয়েছিল চরক সুশ্রুত ও বাগভট্ট। দ্বিতীয় যুগ ৮০০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে শুরু করে তিনশ বছর। অর্থাৎ ১১০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এযুগের রচিত গ্রন্থ বৃন্দ ও চক্রপাণি। এর পর রচিত হয় রসার্ণব, রসসার ও নাগার্জুন রচিত রসরত্নাকর। এইসব গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর গ্রন্থটিকে দু'টি খণ্ডে রচনা করেন। বারো বছর কঠিন পরিশ্রমের পর প্রফুল্লচন্দ্রের অনুসন্ধানের ফল যখন বই আকারে বেরুলো তখন ভারতে ও বিদেশে সর্বত্র খুব সমাদর লাভ করলো। বিজ্ঞানের ইতিহাস যাঁরা পড়ে থাকেন তাঁরা হিন্দু রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের এই সুবৃহৎ বইটির মধ্যে যেন একটি অনাবিষ্কৃত জগতের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হলেন। এই বই নিঃসন্দেহে তাঁর অমূল্য কীর্তি। এর প্রতিটি লাইনে রয়েছে মনীষার স্বাক্ষর।

=চার=

৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোড়।[১] এই বাড়িতে প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মজীবনের অনেকগুলি দিন কেটেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরি গ্রহণ করার অল্পদিন পরে তিনি এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন। পঁচিশ বছর তিনি এখানে বাস করেছিলেন। বাংলার শিল্প জাগরণের ইতিহাসেও সার্কুলার রোডের ওপর এই একানব্বই নম্বর বাড়িটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এইখানেই আচার্যদেবের আর একটি কীর্তিসৌধ বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান সেদিন ভারতবর্ষে এটাই প্রথম ছিল। বেঙ্গল কেমিক্যাল সত্যি প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। এক বাঙালি রাসায়নিকের উদ্যম ও কল্পনা কিভাবে এদেশের শিল্পপ্রচেষ্টার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল সে ইতিহাস জানবার মতো।

১৯০১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে প্রফুল্লচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই লিমিটেড কোম্পানীর সদস্যরা হলেন চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, ভূতনাথ পাল, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু, চারুচন্দ্র বসু, ডাঃ অমূল্যচরণ বসু ও তাঁর পরলোকগত ছাত্র সতীশচন্দ্র সিংহ। প্রতিষ্ঠানটির নামাকরণ হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল

১। এখনকার নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড।

অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করে ও সাফল্যের সঙ্গে এটা পরিচালনা করে. বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র সেদিন শিক্ষিত বাঙালি সন্তানদের সামনে স্বাধীন কর্ম-প্রচেষ্টার যে দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন তা-ই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে তাঁর স্বজাতির কাছে। বিলেতে ছাত্রজীবনে তিনি ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ঔষধ তৈরির কয়েকটি বড়ো বড়ো কারখানা পরিদর্শন করেছিলেন।

অধ্যাপনা ও গবেষণার ফাঁকে প্রফুল্লচন্দ্র সব সময় একটি বিষয়ের চিন্তা করতেন—বাংলার সব জায়গায় প্রকৃতির যে অজস্র দান ছড়িয়ে আছে, তাকে কেমন করে শিল্পের উপাদানরূপে ব্যবহার করা যায় আর অনাহারক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত যুবকদের মুখে কিভাবে অন্ন যোগান যায়। আচার্যদেবের আত্মজীবনী পাঠ করে জানা যায় যে, এই একটি চিন্তা তাঁর মনকে বিচলিত করেছিল। প্রথমে তিনি একটা ছোট জিনিসে হাত দিলেন। লেবুর রস থেকে তৈরি করলেন সাইট্রিক এ্যাসিড। কিন্তু তখনকার কলকাতায় লেবুর আমদানি তেমন ছিল না অথবা দামে তেমন সস্তা ছিল না, যাতে সাইট্রিক এ্যাসিড বিক্রী করে লাভ হতে পারে।

তখন প্রফুল্লচন্দ্র অন্যদিকে মন দিলেন। ঠিক করলেন, তিনি এমন সব জিনিস তৈরি করবেন যা কম পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়, এবং বাজারে সহজে কাটতি হয়। কয়েকবার চেষ্টার পর তিনি ঔষধ সম্পর্কিত দ্রব্য প্রস্তুত করাই উপযোগী বলে ঠিক করলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তেরই পরিণতি 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজে লিখেছেন :

'কলকাতার ঔষধের দোকানগুলি আমি ঘুরে দেখলাম এবং ব্রিটিশ থার্মোকোপিয়ার ঔষধগুলি কি পরিমাণে এদেশে আমদানী হয় তাও আমদানীকারকদের কাছ থেকে জেনে নিলাম। মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল অ্যাণ্ড কোম্পানি তখন সবচেয়ে বড়ো ঔষধ ব্যবসায়ী; তাঁদের কারবারটি খুবই বিস্তৃত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা

ভূতনাথ পাল আমাকে ভরসা দিলেন যে, যদি ঠিকমতো জিনিস সরবরাহ করতে পারি তবে বাজারে ক্রেতার অভাব হবে না। এর পর আমি হীরাকস বা Sulphate of iron নিয়ে কাজ আরম্ভ করলাম। আমি যখন এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, তখন আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। পথপ্রদর্শকও কেউ ছিল না। আমি একাকী অগ্রসর হলাম।'

তখন কলকাতার বাজারে হীরাকসের খুব চাহিদা। পুরানো লোহা (Scrape iron) তখন বিনামূল্যে অজস্র পাওয়া যেত। তিনি সালফিউরিক এ্যাসিড সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিলেন। জানতে পারলেন, এটা আমদানী করতে হয় না। কাশীপুরের ডি. ওয়ালডি অ্যাণ্ড কোম্পানি তখন এই এ্যাসিড প্রচুর পরিমাণে তৈরি করতে আরম্ভ করেছে। বাঙালিদের মধ্যে দু'একজন তৈরি করতেন। এইভাবে কলকাতার আশপাশে তিন-চারটি কারখানায় সালফিউরিক এ্যাসিড তৈরি হতো—সব কয়টিরই মালিক ছিল বাঙালি। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর কাজের জন্য ডি. ওয়ালডির কাছ থেকেই ঐ এ্যাসিড সংগ্রহ করতেন।

এরপর প্রফুল্লচন্দ্র একে একে সাজিমাটি, ফসফেট অব সোডা ও সুপার ফসফেট অব লাইম নিয়ে পরীক্ষা করলেন। সাজিমাটি থেকে তৈরি করলেন কার্বনেট অব সোডা। কিন্তু খরচ পোষাল না, কারণ বাজারে ভালো সাজিমাটি সস্তায় বিক্রী হয়। তখন একটি বিদেশী কোম্পানির কারখানায় এই জিনিস তৈরি হতো এবং তারা এশিয়ার বাজার একচেটে করে ফেলেছিল। তখন তিনি বুঝলেন সাজিমাটিতে সুবিধা হবে না। ফসফেট অব সোডা আর সুপার ফসফেট অব লাইম এই দুটো জিনিসই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতো। কেন আমদানী করতে হয় ?—ভাবলেন প্রফুল্লচন্দ্র। গরু, মোষ প্রভৃতি পশুর হাড় থেকে এই জিনিস তৈরি হয়; এইসব হাড় তো বিদেশে রপ্তানি করা হয়। কাছেই রাজাবাজারের কসাইয়ের দোকান।

সেখান থেকে তিনি কয়েক বস্তা কাঁচা হাড় কিনে বাড়ির ছাদে শুকোতে দিলেন।

এর ফলে একটা বিভ্রাট ঘটলো। আচার্যদেব নিজেই লিখেছেন: 'তখন শীতকাল। কিন্তু সেই বছর জানুয়ারি মাসে পনেরো দিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি হলো। তার ফলে হাড়ের গায়ে লেগে থাকা মাংস পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেই পচা মাংসে সুতোর মতো পোকা জন্মালো। অমনি সেই পোকা খাবার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে কাকের দল আমার বাড়ি আক্রমণ করলো ও মনের আনন্দে পচা মাংস ও পোকা খেতে থাকে আর হাড়গুলো ঠোঁটে করে প্রতিবেশীদের বাড়িতে ছড়াতে লাগল। চারিদিকেই নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাস। তাঁরা ছাদের হাড়গুলো অন্য কোথাও সরিয়ে নেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন।' তখন হাড়গুলো অন্যত্র সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয় ও সেইখানেই ফসফেট অব সোডা তৈরি হয়।

এবার প্রফুল্লচন্দ্র ঔষধ তৈরির দিকে মন দিলেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের সংযোগে পাশ্চাত্যে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছেন। স্বদেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী তাই একটি শিল্প গড়ে তোলার কথা চিন্তা করলেন। ঠিক করলেন ঔষধের ব্যবসাই তিনি করবেন। এর চাহিদা আছে আর অল্প মূলধন নিয়ে সামান্যভাবে এটা আরম্ভ করা যেতে পারে। তাঁর এই চিন্তা থেকেই বাংলার মাটিতে এই শতকের গোড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিল বেঙ্গল কেমিক্যাল—ভারতে ঔষধ তৈরির প্রথম কারখানা। এদেশে আকর লোহা থেকে ইস্পাত তৈরির স্বপ্ন যেমন দেখেছিলেন জামশেদজী টাটা আর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছিল বিহারের মাটিতে, তেমনি প্রফুল্লচন্দ্রের স্বপ্নও রূপ নিয়েছিল এই মহানগরীর উপকণ্ঠে—মানিকতলার জলা-জঙ্গলে ভরা এক ভূখণ্ডের উপর। ভারত-বাসীর এই দুটি উদ্যমই ছিল প্রায় একই সময়ের ঘটনা আর এই দুটি উদ্যমই সেদিন বিশ্বের শিল্প মানচিত্রে ভারতবর্ষকে স্থাপন করে

দিয়েছিল। জামশেদজী ও প্রফুল্লচন্দ্র—ভারতের এই দুই সুসন্তান ভারতবাসীর নমস্য।

রূপকথার মতোই বিস্ময়কর বেঙ্গল কেমিক্যালের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতির কাহিনী। তোমরা বড়ো হয়ে সেই ইতিহাস জানবে। এখানে শুধু এইটুকু জেনে রেখো যে, নানারকমের বাধাকে জয় করে প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর এই উদ্যমে সফলতা লাভ করতে হয়েছিল। তিনিই তো শিল্পবিমুখ এই দেশে সেদিন একটা বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

রাসায়নিকের উদ্যমের মধ্যে ছিল সেই সাধনার পরিচয়। সাধনার সঙ্গে ছিল নিষ্ঠা। এই সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রফুল্লচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন এশিয়ার বৃহত্তম ভেষজ দ্রব্য তৈরির প্রতিষ্ঠান—বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এক রাসায়নিক ও এক চিকিৎসকের মিলিত প্রয়াসের ফল। দেশীয় গাছ-গাছরা থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঔষধ তৈরি করার দৃষ্টান্ত এদেশে বেঙ্গল কেমিক্যালই প্রথম স্থাপন করেছিল। কালমেঘ, কুর্চি, বাসকপাতা ও যোয়ান প্রভৃতি থেকে যে কয়টি ঔষধ তৈরি হয়েছিল সেগুলি অল্পদিনেই বাজারে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আগে বিলাতি টলুর সিরাপ লোকে ব্যবহার করত, কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যালের সিরাপ অব বাসক বেরুবামাত্র ঐ বিলাতি ঔষধটির চাহিদা কমতে থাকে।

নবজাত এই প্রতিষ্ঠানটিকে দাঁড় করাবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্রকে কি রকম পরিশ্রম করতে হতো, সে-কথা তিনি এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: 'কলেজ থেকে ফিরে রোজ বিকেলে আমি কারখানায় যেতাম। প্রথমেই আগের দিনের অর্ডারগুলো দেখতাম; সেগুলি যাতে শীঘ্র সরবরাহ হয় তার ব্যবস্থা করতাম। কলেজ ল্যাবোরেটরি থেকে আমার ফার্মেসীর ল্যাবোরেটরিতে যাওয়া আমার কাছে বিশ্রামের মতোই ছিল। আমি তখনি আমার নতুন কাজে প্রবৃত্ত হতাম এবং

বিকেল সাড়ে চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খেটে কাজ শেষ করতাম। তখন কঠোর পরিশ্রম করেও আমার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হতো না। আমি একাদিক্রমে দশ-বারো ঘণ্টা পরিশ্রম করতাম।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আপনভোলা ছিলেন একথা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু যথাস্থানে সঠিক কর্মী নিয়োগ ও বাজারের চাহিদা নিরূপণে তাঁর ছিল বিশেষ দক্ষতা। কারখানাটিকে তিনি কিভাবে ধাপে ধাপে উন্নত করেছিলেন তাঁর একটি চিত্র তোমাদের কাছে তুলে ধরছি—

সাল	তৈরি শুরু হয়
১৯২২	আলকাতরা ডিসটিলেশন
১৯২৯	সিরাম, ভ্যাকসিন, ইনজেকশন ও অন্যান্য ঔষুধ,
১৯৩১	সালফিউরিক অ্যাসিড (ভারতে প্রথম রিকভারী ব্যবস্থায়)
১৯৩৪	সাবান
১৯৩৫	ন্যাপথালিন
১৯৪০	কনট্যাক্ট সালফিউরিক অ্যাসিড, (এই প্লান্টে সে সময় দৈনিক ২০ টন অ্যাসিড তৈরি হত)।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যে সব সুযোগ্য কর্মীর সাহায্যে কারখানাটিকে সফল করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ রায়, মণীন্দ্রচন্দ্র বকসী, প্রফুল্লরতন ঘোষ, যতীশচন্দ্র পর্বত, ডাঃ হেমেন্দ্র নাথ ঘোষ, ডাঃ চারুচন্দ্র বসু, জগদিন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সুরেন্দ্রভূষণ সেন ও সত্যপ্রসন্ন সেন। পরবর্তী সময়ে আচার্যদেবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত কর্মীরা বাংলার বাইরেও প্রতিষ্ঠানের শাখা খুলেছিলেন ও নানা নূতন জিনিস প্রস্তুত শুরু করে আজকের বেঙ্গল ক্যামিকেলের সূচনা করেন।

১৯০১ সালে যখন "বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড" চালু হয় তখন সর্বসাকুল্যে কোম্পানীর মূলধন ছিল ২৩৫০০ টাকা। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মানিকতলায় ১০ বিঘে জমি কেনা হয়। ১৯০৫ সালে মানিকতলার কারখানায় পুরোদমে কাজ চলতে থাকে। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী ছিলেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে দিয়ে কারখানায় নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসানো শুরু করেন। ১৯০২ সালের গোড়া থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত কারখানার কাজকর্ম চালাবার ভারছিল ডাঃ কার্তিক বসু ও ভূতনাথ পালের ওপর। এর পর বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগদান করেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক রাজশেখর বসু। তিনি ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রফুল্লচন্দ্র লক্ষ্য করলেন বাজারের চাহিদা অনুসারে কারখানাকে তৈরি করতে হবে। যে সময় বাজারে সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, ক্যাফিন ইত্যাদির চাহিদা ছাড়াও আরও নানারকমের নূতন জিনিসের চাহিদা দেখা যেতে লাগল। প্রফুল্লচন্দ্র দেখলেন মানিকতলায় সব রকম জিনিস উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তিনি ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে কলকাতার কাছে নূতন বিভাগ খোলার জন্য ১৫০ বিঘে জমি কিনে ফেললেন।

সে সময় বেঙ্গল ক্যামিকেলের ঔষধ বিক্রির প্রাথমিক প্রচেষ্টায় যে সব স্বদেশপ্রেমী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্রকে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর ও সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারী।

বেঙ্গল কেমিক্যাল একদিকে যেমন প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা ও পরিশ্রমের চিরস্থায়ী স্মৃতিসৌধ, অন্যদিকে এ তেমনি বাঙ্গালির সংহত প্রয়াসের একটা উন্নত কীর্তিস্তম্ভ। যিনি সারাজীবন বাঙালির অন্নসমস্যার কথা চিন্তা করেছিলেন, যিনি তাঁর স্বজাতির মস্তিষ্কের অপব্যবহার দেখে বাঙালি যুবকদের ধিক্কার দিয়েছিলেন, সেই মানুষটি

ভারতবর্ষে রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্য তৈরির একটি শিল্পের প্রবর্তন করে, ভারতের শিল্প জাগরণের ইতিহাসে যে অধ্যায় রচনা করে গিয়েছেন, তা সমস্ত ভারতের প্রেরণার স্থল হয়েছে। বাঙালিকে—ভারতবাসীকে তিনি নতুন করে শ্রমের মর্যাদা শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র নিজের জন্য কিছু রেখে যান নি। জগদীশচন্দ্র যেমন তাঁর বিজ্ঞানমন্দির ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় দেবচরণে নিবেদন করেছিলেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও তেমনি বেঙ্গল কেমিক্যালকে দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণেই দান করে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর নিজের ছাপ্পান্ন হাজার টাকার শেয়ার তিনি কোম্পানিকেই দান করেন। তাঁর মহত্ব এইখানেই।

১৯০৪ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি প্রফুল্লচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিলাত গেলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে এই বিলাত যাওয়া খুব সহজে হয় নি, যেমনটি হয়েছিল তাঁর বন্ধু জগদীশচন্দ্রের ক্ষেত্রে। কারণ তিনি ছিলেন প্রাদেশিক সার্ভিসের লোক আর জগদীশচন্দ্র ছিলেন I. E. S অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল এডুকেশনাল সার্ভিসের লোক। তাই ছুটি পাবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্রকে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। লণ্ডনে এসে তিনি কিছুদিন ডেভি-ফ্যারাডে রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে কাজ করলেন। মাঝে মাঝে ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়ান্স ও ইউনিভার্সিটি কলেজে ল্যাবোরেটরিগুলি দেখে আসতেন। এছাড়া এখানকার বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার কাজও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এবার যখন তিনি এলেন তখন ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী সমাজে তিনি আর অপরিচিত ছিলেন না। কারণ এখানকার কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে এদেশের সর্বত্র শুধু পরিচিত নয়, খ্যাতিমানও করে তুলেছিলেন। 'ডক্টর পি. সি. রায়'—নামটি তখন লণ্ডন, প্যারিস ও বার্লিনে ছড়িয়ে পড়েছিল, সর্বত্র তাঁর অভ্যর্থনার জন্য ধুম পড়ে গিয়েছিল।

তিন মাস লণ্ডনে কাটিয়ে বড়দিনের ছুটিতে প্রফুল্লচন্দ্র এলেন

এডিনবার্গে। এখানে কয়েকজন পুরাতন সহপাঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো—তাঁরা সবাই একবাক্যে মার্কিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কর্তাকে সাক্ষাৎভাবে অভিনন্দিত করলেন। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রগণ স্থানীয় একটি হোটেলে একটি সভা করে প্রফুল্লচন্দ্রকে সংবর্ধিত করলো। ছাত্রদের প্রদত্ত মানপত্রের একটি লাইনে লেখা হয়েছিল: 'আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানাকাশে যুগপৎ দুইটি চন্দ্রের উদয়ে কেবলমাত্র ভারতের মানসলোকই উদ্ভাসিত হয় নি ইউরোপের বিজ্ঞানজগতের ওপরও তার কিরণসম্পাৎ হয়েছে, আপনাদের দুজনকে নিয়ে তাই আমাদের গর্বের সীমা নেই।'

বার্লিনে এসে অধ্যাপক এমিল ফিসারের ল্যাবোরেটরিটিও তিনি দেখলেন। ফিসার তখন প্রোটিন থেকে উৎপন্ন 'অ্যামিনো অ্যাসিড' নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁর গবেষণা পদ্ধতির খুব প্রশংসা করতেন প্রফুল্লচন্দ্র। 'জার্মান জার্নাল অব ইনঅরগানিক কেমিস্ট্রি'র সম্পাদক অধ্যাপক রিচার্ড লোরেঞ্জের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। এই পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। জার্মানি থেকে তিনি এলেন ফরাসী দেশে। নব্য রসায়নের উৎপত্তির ইতিহাসের সঙ্গে প্যারিসের নাম জড়িয়ে আছে। এইখানেই আধুনিক রসায়নবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ল্যাভোসিয়ারের যুগান্তকারী গবেষণার ফলে এমন সব সত্য আবিষ্কৃত হয়েছিল, যার ফলে পুরানো অনেক মতবাদ নিরাবৃত হয় এবং এইখানেই একে একে ইউরোপের বহু রাসায়নিক তাঁর পতাকাতলে এসে মিলিত হন ও তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র বলতেন, 'নব্য রসায়নে ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে, প্যারিস তা-ই পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের আকাঙ্ক্ষিত তীর্থক্ষেত্র।' সেই তীর্থক্ষেত্রে আজ এসে প্রফুল্লচন্দ্র যেন নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

প্যারিসে এসে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে বার্থেলোর সঙ্গে যখন তিনি পরিচিত হলেন, তখন, প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন, 'আমার

সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। মনে হলো আমি অবশেষে সেই বিখ্যাত মনীষী ও বিজ্ঞানাচার্যের সামনে উপস্থিত হয়েছি যিনি তাঁর সারা জীবন পাশ্চাত্য রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চায় অতিবাহিত করেছেন এবং পৃথিবীতে যিনি সিনথেটিক কেমিস্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য।' এই বার্থেলোই তার 'হিন্দু রসায়ন' বইটির প্রশংসা করে-ছিলেন। পরিচয়ের সূত্র ছিল এই বইটি। প্যারিসে প্রবীণ বার্থেলো (১৮২৭—১৯০৭) ভারতীয় তরুণ রাসায়নিককে সেদিন যে রকম আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তা প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে চির-স্মরণীয় হয়ে ছিল। একদিন অ্যাকাদেমির অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার জন্য বার্থেলো প্রফুল্লচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করলেন। এই দুর্লভ সম্মানলাভে তিনি যারপরনাই গৌরব বোধ করেছিলেন।

॥ পাঁচ ॥

এইভাবে প্রায় সাত-আট মাস কাল ধরে প্রফুল্লচন্দ্র ইউরোপের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তন্ন তন্ন করে দেখে বেড়ালেন। সব জায়গাতেই তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে দেখতেন পরীক্ষাগারগুলি। আর ইউরোপের যে যে দেশে তিনি গিয়েছিলেন, সেখানেরই বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী তাঁকে পণ্ডিতব্যক্তি (Savant) বলে সাদরে অভ্যর্থনা করেছেন। স্বদেশের হয়ে এই যে তিনি ইউরোপের কাছ থেকে সম্মান আদায় করেছিলেন তখনকার ভারতবর্ষে এর প্রভাব বড় কম ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্র প্যারিসে এসেছিলেন ১৯০৫ সালে; এর পাঁচ বছর আগে। এখানে বিজ্ঞানীদের মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁর সতীর্থ জগদীশ-চন্দ্র। ইউরোপের জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করে রাসায়নিক যথাসময়ে স্বদেশে ফিরলেন।

এরপর তিনি তৃতীয়বার বিলাত গিয়েছিলেন ১৯১২ সালে। ঐ বছর লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট প্রফুল্ল-চন্দ্র ও দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। এইবার লণ্ডনে থাকবার সময় সেখানকার কেমিক্যাল সোসাইটির সভায় অ্যামোনিয়াম নাট্রাইট সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এর ফলে ইংলণ্ডের

রসায়ন জগতে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কংগ্রেসে যোগদান করতে আসার আগে থেকেই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে এবিষয়ে গবেষণা করে সাফল্যলাভ করেছিলেন। আচার্যদেবের বিবরণ থেকে জানা যায় যে এই গবেষণায় তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন তরুণ বৈজ্ঞানিক নীলরতন ধর। লণ্ডনের 'নেচার' (Nature) পত্রিকায় তাঁর এই গবেষণার প্রশংসামূলক মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির, বিশেষভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করে বলেছিলেন: 'ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এমন অনেককে গড়ে তুলেছে, যাঁরা দেশের গৌরব ও অলঙ্কারস্বরূপ। অথচ, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ডিগ্রিকে তুচ্ছ মনে করা হয়। কিন্তু একটা কথা আপনারা মনে রাখবেন, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, সর্বশ্রেষ্ঠ সার্জন, সর্বশ্রেষ্ঠ ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ, সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত বর্তমান উপাচার্য[১] —এঁরা প্রত্যেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়র উপাধিধারী।' ভাষণের উপসংহারে যখন তিনি বললেন: 'ভারতে আমরা স্মরণাতীত কাল থেকে উচ্চচিন্তা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের আদর্শ অনুসরণ করে আসছি'—তখন তিনি উচ্ছ্বসিত করতালি দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

ঐ একই সময়ে রয়্যাল সোসাইটির ২৫০তম বার্ষিক উৎসব হয়। প্রফুল্লচন্দ্র এই উৎসবেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত ডি. এস-সি উপাধিতে ভূষিত করলেন। ১৯২০ সালে প্রফুল্লচন্দ্র চতুর্থবার

১। তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইংলণ্ড যান। এইবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পাঠিয়েছিলেন উচ্চাঙ্গের রসায়ন-চর্চা করবার জন্য। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন বাঙালি ছাত্রও বিলাতে পড়তে যান। এবারও নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়ে ও গবেষণা করে তিনি ফিরে আসেন। এইবার বিলাত থেকে ফিরে এসে, আচার্য রায় এই দেশে রসায়নশাস্ত্রের পঠন পাঠনের উন্নতির প্রতি মন দিলেন ও একটি নব্য রাসায়নিক গোষ্ঠী তৈরি করেন—এও ছিল তাঁর আর একটি মহৎ কীর্তি।

১৯২৬ সালে তিনি আবার বিলাত গিয়েছিলেন। সে-বছর বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসের অধিবেশন কেমব্রিজে বসেছিল। প্রফুল্লচন্দ্র এই কংগ্রেসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, তৃতীয়বার প্রফুল্লচন্দ্র যখন ইউরোপ থেকে ফিরলেন, তখন ভারত সরকার তাঁকে 'সি. আই. ই' উপাধিতে ভূষিত করেন। এর তিন বছর পরে, ১৯১৫ সালের নববর্ষে তিনি 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি কোন উপাধি বিশেষের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না। তিনি কেবলমাত্র তাঁর কর্তব্য সাধনে একনিষ্ঠ ছিলেন। সেই বছর প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ মিলিতভাবে তাঁকে এক বিশেষ সভায় সংবর্ধিত করলেন।

বাংলায় একদল নব্য রাসায়নিকের সৃষ্টি প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ দান এবং অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব এইখানেই। ছাত্রের কৃতিত্বে শিক্ষকের গৌরব—তাঁর জীবনে এই সত্যটা যেভাবে প্রমাণিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আধুনিক ভারতবর্ষের একমাত্র আচার্য যদুনাথ সরকার ভিন্ন আর কোন অধ্যাপকের জীবনে দেখতে পাওয়া যায় না। বিদ্যা অর্জনে প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন যেমন নিরলস, বিদ্যাদানেও ঠিক তেমনি উদার ও অকৃপণ। অধ্যাপক-জীবনে তিনি যদি আর কিছু না করতেন, তাহলেও শুধুমাত্র নব্য রসায়ন গোষ্ঠী সৃষ্টি করে তিনি চির-স্মরণীয় হয়ে থাকতেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিরাট তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী, এঁরাই তাঁর সাধনার উত্তরাধিকারী। এঁদের

মধ্যে ডঃ রসিক লাল দত্ত, ডঃ নীলরতন ধর, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ডঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক অতুলচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী, মানিকলাল দে, ডঃ জ্ঞান রায়, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, পুলিন সরকার, ডঃ প্রিয়দারঞ্জন রায়, প্রমুখ পরবর্তীকালে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। দেশ-বিদেশে প্রফুল্লচন্দ্রের খ্যাতি যে তাঁর নিজের হাতে তৈরি প্রতিভাবান ছাত্রদের কৃতিত্বের জন্যই শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল—তা অত্যুক্তি নয়।

ছাত্রের গৌরবে গুরুর গৌরব।
ভারতবর্ষের এই চিরন্তন আদর্শ।
সেই আদর্শ আমরা ভুলে গিয়েছিলাম।

এ যুগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই আবার সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এদেশে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মৌলিক গবেষণার সূচনা তো তিনিই করে গিয়েছেন। ছাত্রদের মধ্যে গবেষণার আগ্রহের সৃষ্টি করে আমাদেরকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে হলে প্রতিভার বেশি আরও কিছু দরকার। প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে তা-ই ছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এটা ধরা পড়েছিল। তিনি তাই বলেছেন: 'প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করেছেন। কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকে পেয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের 'আচার্য' উপাধি সার্থক। তিনি আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ গুরু। ছাত্রেরাই ছিল তাঁর আত্মীয় বন্ধু, তাদের মধ্যেই তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই জ্ঞান-তপস্বীর জীবনের প্রকৃত মহিমা এইখানেই।

॥ ছয় ॥

১৯১৬।

কলেজের চাকরি থেকে অবসর নিলেন প্রফুল্লচন্দ্র।

এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ছাত্রেরা আচার্য রায়কে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অঞ্জলি নিবেদন করে, তাঁকে একখানি মানপত্র প্রদান করল। সেই মানপত্রে বলা হয়েছিল ঃ

'আপনার কৃতিত্ব অসামান্য। আপনার সরল জীবনযাপন প্রণালী আমাদিগকে যেন প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আপনি চিরদিনই আমাদের বন্ধু, গুরু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। আপনার প্রকৃতি সর্বদাই মধুর—বহুবিধ দুর্লভ গুণেই আপনি ছাত্রদের প্রীতি অর্জন করিয়াছেন। দরিদ্র ছাত্রদিগকে কেবল সৎ পরামর্শ দিয়া নহে, অর্থ দ্বারাও আপনি সহায়তা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কঠোর ব্রহ্মচর্যপূত অনাড়ম্বর জীবন আপনার—আপনার মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতের গুরুর আদর্শেরই পুনরাবির্ভাব দেখিতেছি।'

মানপত্রে যা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ছাত্রবৎসল অধ্যাপকের যে দৃষ্টান্ত সেদিন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রদের সামনে স্থাপন করেছিলেন সত্যিই তার তুলনা নেই। ছাত্রদের মধ্যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন—এই

গুণেই তিনি তাদের অমন শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সেই বিদায় সংবর্ধনা সভায় আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি যখন বললেন: 'আমি আশা করি যে, আমরা যে আগুন মৃদুভাবে জ্বেলেছি, তা ছাত্র-পরম্পরায় আরো উজ্জ্বল হতে থাকবে ও অবশেষে সেই অগ্নিশিখা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আলোকিত করবে'—তখন তাঁর এই কথাগুলো উপস্থিত সকল ছাত্রের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। সেই সময়ে তাঁর সতীর্থ জগদীশচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের এক বছর পরে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নেবার পর, আশুতোষের অনুরোধে, প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের 'পালিত অধ্যাপক'[১] হিসাবে যোগদান করেন। এইভাবেই শুরু হয় শিক্ষকজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। এ অধ্যায় ছিল আরো গৌরবময়, কারণ তখন থেকেই তিনি এক নবীন রাসায়নিক গোষ্ঠী তৈরি করে, এদেশে রসায়নবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে জোয়ার এনে দিয়েছিলেন। পরবর্তী বিশ বছর কাল তিনি বিজ্ঞান কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এইখানেই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি ঘর ছিল তাঁর আবাসগৃহ। একটি খাটিয়া, দুটি চেয়ার, একটি খাওয়ার ছোট টেবিল, লেখাপড়ার জন্য একটি টেবিল ও একটি আলনা—এই ছিল ঘরের আসবাব।[২]

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনযাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "প্রত্যেকটি কাজের জন্য সময় ছিল নির্দিষ্ট। শৃঙ্খলা অনুসারে তিনি কাজ করিয়া যাইতেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের

১। বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল বাংলার দুই সুসন্তানের বিরাট দান। স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষ কয়েক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তাঁদের নামেই দুটি অধ্যাপকের পদ—পালিত অধ্যাপক ও ঘোষ অধ্যাপক সৃষ্টি হয়।

২। স্মৃতিচিত্রটি আচার্যের সহযোগী রবীন্দ্রনাথ রায়ের।

শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ভোর পাঁচটা বাজিলেই তিনি প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইতেন। সময় সময় এই ক্ষীণ দেহী ঋষির সঙ্গী হইবার চেষ্টা করিয়াছি। (আমি) গ্রামের ছেলে কিন্তু নাগাল রাখিতে পারি নাই। হয়তো দুইবার তাঁহার ঘোরা শেষ হইল কিন্তু আমার যে মোটেই একবার শেষ হইল না এমন জোরে তিনি হাঁটিতেন। তারপরে কিছু প্রাতর্ভোজন। তারপর নয়টা পর্যন্ত পড়া ও শোনা। অর্থাৎ কিছুক্ষণ নিজে পড়িতেন তারপর একজন পড়িয়া যাইত তিনি শুনিতেন, তদনন্তর পত্রোত্তর, লোকজনের সহিত দেখাশোনা। দশটার পরে স্নান ও সামান্য আহার। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকা, তারপরে ২টা হইতে পুনরায় পড়া, শোনা ও লিখা, লোকজনের সহিত কথাবার্তা বলা। বৈকালে পুনরায় ভ্রমণ। কলিকাতায় থাকিলে গড়ের মাঠে গিয়া বসিয়া থাকা। আর পানিহাটিতে থাকিলে হয় পুকুরে নৌকায় চড়া—কিম্বা ব্যারাকপুরের মাঠে যেখানে জল গঙ্গার তীরে দূর্বাদলে আসিয়া দোল খায় সেখানে বসিয়া গঙ্গার শোভা দেখার সহিত মুক্ত বায়ু সেবন। এই সময় অনেকেই তাঁহার সাথী হইতেন। তাঁহার একটি টেঁক ঘড়ি ছিল, লম্বা কালো রং-এর ফিতা দিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখিতেন। সময়জ্ঞান এমন নিখুঁত ছিল যে অন্ধকারে যখন পুকুর হইতে নামাইতে বলিতেন কিম্বা গঙ্গার ধার হইতে উঠিতেন তখন আটটা বাজিত। দেখিয়াছি কোনদিন দু'চার মিনিট কম কিম্বা বেশি। এই ভ্রমণকালে নানা দেশ-বিদেশের কথা, জাতির সমস্যা, কত লোকের অন্নসংস্থান, কত ছাত্রের বেতন, থাকিবার ব্যবস্থা, পরীক্ষার ফিস্—সকল সমস্যার মীমাংসা হইত।

তেজস্বিতা, দৃঢ়তা ও সময়ানুবর্তিতার একটি সুন্দর ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল লাহোরে। তাঁহাকে আপ্যায়ন করিবার জন্য লালা হরকিষেণলাল এক চা-পান সভার অনুষ্ঠান করেন। এবং সভার সময় জানাইয়া তাঁহাকে

নিমন্ত্রণ করেন। আচার্যদেব নির্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হন। কিন্তু কাহাকেও উপস্থিত দেখেন না। জনৈক স্বেচ্ছাসেবক তাঁহাকে বসাইয়া চা পান করিতে অনুরোধ করিলে তিনি চা খাইয়া চলিয়া আসেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কিছু পরেই লালাজী তাঁহার হোটেলে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং পুনরায় 'চা' চক্রে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আচার্যদেবের একই উত্তর দেন—যে যথাসময়ে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন। পুনরায় আর যাইবেন না। কিছুতেই তাঁহাকে রাজী করান যায় নাই। পানিহাটিতে থাকার সময় একদিনের ক্ষুদ্র একটি ঘটনা। সেদিন কলকাতার সায়েন্স কলেজে কোন সভা ছিল। তাঁহার গাড়ি রাস্তায় বিকল হইয়াছে খবর পাওয়া গেল। তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন, কারখানার লরী আনিতে বলিলেন। আমি ইতস্ততঃ করিতেছি কিন্তু তাঁহার আগ্রহে অন্য কোন যান না পাইয়া লরীই আনা হইল —ভাবিলাম বৃদ্ধ ভদ্রলোক লরীতে যাইবেন আমি সঙ্গে যাই, লরীতে উঠিয়া ঘড়ি বাহির করিলেন, ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যথাসময়ে পৌঁছিতে পারিবেন। তখন চাঞ্চল্য প্রশমিত হইল, শিশুর মতন উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, দেখ নিজেদের লরী, কি সুন্দর গতি, যেন রাজরথ, সকলকে জানাইয়া যায়, আর তোর কিনা আপত্তি।'

বিজ্ঞান কলেজের ল্যাবোরেটরি আর তরুণ ছাত্রদের সাহচর্য— এরই মধ্যে জ্ঞানতপস্বী প্রফুল্লচন্দ্রের দিনগুলি অতিবাহিত হতে থাকে। এই দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে তিনি যেন নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ১৯২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দশ হাজার টাকা দিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের এই দান থেকেই রসায়নে 'নাগার্জুন পুরস্কার' সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞান কলেজে এই কিন্তু তাঁর একমাত্র দান ছিল না। আগেই বলেছি আচার্য রায় এখানে প্রথম থেকেই রসায়ন শাস্ত্রের 'পালিত অধ্যাপক' নিযুক্ত হয়েছিলেন। যখন তাঁর বয়স

ষাট বছর পূর্ণ হলো, তিনি নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আরো পাঁচ বছরের জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে একটি চিঠিতে লিখলেন : 'আমার জীবনের বাকী দিনগুলো বিজ্ঞান কলেজের ল্যাবোরেটরিতে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু এই কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আর বেতন নিতে আমি অক্ষম। সেজন্য আমার নিবেদন যে, পালিত অধ্যাপকের প্রাপ্য মাসিক এক হাজার টাকা আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যাতে এই টাকা বিজ্ঞান কলেজে রাসায়নিক বিভাগের উন্নতিকল্পে খরচ হতে পারে।'

এই মহত্ত্বের কোন তুলনা আছে ?

এইভাবে আচার্য রায় বিশ্ববিদ্যালয়কে ষাট হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আদর্শ গুরুর মতো বিজ্ঞান আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। পৃথিবীতে এমন অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত আর নেই। সমস্ত ভারতবর্ষ সেদিন মুগ্ধ হয়ে তাঁর এই অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের কথা শুনেছিল। শিক্ষা প্রসারের জন্য আজীবন তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করেছেন। জন্মভূমি রাড়ুলিতে তাঁর পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিতে তিনি বহু অর্থ দান করেছিলেন। কলকাতার সিটি কলেজও তাঁর দান থেকে বঞ্চিত হয়নি। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও তাঁর দানের পরিমাণ কম ছিল না। দ্বিতীয়বার যখন তিনি বিলাত থেকে ফিরে আসেন তখন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রফুল্লচন্দ্রকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। এজন্য তাঁকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা গ্রহণ করেন নি, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলেই দান করেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি পারিশ্রমিক নিতেন না।

এই দানশীলতা সেই চিরকুমার জ্ঞানতপস্বীর চরিত্রকে এক আশ্চর্য মহিমায় মণ্ডিত করেছে। তাঁর দানের ক্ষেত্র ছিল শিক্ষা, আর দানের

পাত্র ছিল ছাত্রসমাজ। অনেক মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর শিক্ষকজীবনের আরম্ভ থেকেই মাইনের বেশিরভাগ গরিব ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এমন দৃষ্টান্ত এদেশে আর কোন অধ্যাপক আজ পর্যন্ত স্থাপন করতে পারেন নি।

১৯২০।

এই বছরে তিনি নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। সভাপতিরূপে তিনি 'বর্তমান ভারতে বিজ্ঞানের আবির্ভাব' সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার মূল বক্তব্য ছিল যে—ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক বিভাগের উচ্চ পদগুলিতে কৃতী ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের নিয়োগ করা উচিত। প্রচলিত সরকারী নীতির বিরোধী এমন কথা বলার সাহস সেদিন একমাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল।

আচার্য রায়ের আর একটি কর্মকীর্তির কথা উল্লেখ করব। এ-দেশের রসায়নবিদ্‌দের একটি প্রধান অসুবিধা এই ছিল যে, তাঁদের মৌলিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করার জন্য ইংলণ্ড, জার্মানি অথবা আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় পাঠাতে হতো। এই অসুবিধা দূর করার কথা তিনি চিন্তা করলেন এবং চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হলেন। স্থাপন করলেন 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি।' এ হলো ১৯২৩ সালের ঘটনা। বিলাতের কেমিক্যাল সোসাইটির ধরনে এটা গঠিত হয়েছিল। তিনিই ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। সমিতি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় Journal of the Indian Chemical Society, প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্ররাই এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে জার্নালের যে বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার মুখবন্ধে সোসাইটির পক্ষ থেকে আচার্যদেবের উদ্দেশে বলা হয়েছিল: 'আপনার দান ব্যতীত এই সমিতি তার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হতে পারত না।' এর থেকে

জানতে পারা যায় যে, এই সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রফুল্লচন্দ্রের আর্থিক দানের পরিমাণ বড়ো কম ছিল না।

বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করবার সময় ১৯২৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সম্মানও তাঁর প্রাপ্য ছিল।

এইবার সমাজ-সংস্কারক প্রফুল্লচন্দ্রের কথা।

যে মানুষটি নিভৃতে তাঁর বিজ্ঞানমন্দিরে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে ভালবাসতেন, সেই মানুষটি সারাজীবন নানাভাবে সমাজের কথা চিন্তা করেছেন। সমাজের ব্যাধিগুলি যাতে দূর হয়ে যায়, সেজন্য তাঁর চিন্তা-ভাবনার যেন অন্ত ছিল না। যাতে হিন্দু সমাজে স্ত্রীশিক্ষা এবং বিধবা-বিবাহের প্রচলন হয়, অস্পৃশ্যতা ও ছুৎমার্গ দূর হয়, সেজন্য তিনি অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি সর্বভারতীয় মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই ভাষণে তিনি পণ-প্রথা ও অস্পৃশ্যতার কুফল সম্বন্ধে বিশেষভাবে ও মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচনা করেন। এই বক্তৃতায় সমাজনেতাদের চাবুক মেরে তিনি বলেছিলেন ঃ

'এই ভণ্ডামি আর চলবে না। বরফ খাব, সোডা খাব, স্টিমারে-রেলে বাবুর্চির রান্না খাব, সাহেবের হোটেলে খাব, আবার নামাবলীও ঠিক রাখব, এ হয় না।...এই ছুৎমার্গের হাত এড়াতে না পারলে হিন্দুধর্ম পৃথিবী থেকে লোপ পাবে। এসব ছাই-পাঁশ দূরে ফেলে দিয়ে, হিন্দুজাতিকে সকল রকম কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। নোংরা দেশাচার পাপাচার আঁকড়িয়ে থাকলে চলবে না।'

এ যেন স্বামী বিবেকানন্দেরই কথা।

প্রফুল্লচন্দ্র চাইতেন না যে, সমাজের কেবল উচ্চজাতির বা উচ্চ বর্ণের দু'দশজন বড়ো হয়; তিনি চাইতেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে

দেশের সব মানুষই উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তিনি চাইতেন যাদেরকে আমরা প্রতিদিন ঘৃণার চক্ষে দেখি, তাদের যেন আমরা ভাই বলে কোলে টেনে নিতে পারি। এসব কথা তিনি মুখে ও কাগজে প্রচার করে ক্ষান্ত ছিলেন না, সব সময়ে কাজেও তা দেখাতে চাইতেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি একলা কম কাজ করেন নি।

প্রতি বছর গরমের ছুটিতে তিনি দেশে যেতেন। তখন তিনি বেশির ভাগ সময় মাহিষ্য, পোদ, কৈবর্তদের সঙ্গে কাটাতেন। তাঁর বড়দাদা কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না ; সময়ে সময়ে বলতেন, 'ফুলু, (ছেলেবেলায় বাড়িতে সবাই তাঁকে এই নামে ডাকতো) তুই চাষাদের এত আস্কারা দিসনা, শেষে খাজনা আদায় করা দায় হবে।' প্রফুল্লচন্দ্র কিন্তু এ-কথা বিশ্বাস করতেন না, ছোট-বড়ো সকল জাতির মানুষের মধ্যেই তিনি মহত্ত্ব দেখতে পেতেন। বলতেন, আমি কোন সমাজভুক্ত নাই। আমি হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব সব নিই। আমি রাসায়নিক, আমি নিক্তির ওজন করে সকলের ভালোমন্দ ওজন করে বিচার করতে চাই।'

প্রফুল্লচন্দ্র জাতিভেদ মানতেন না। জাতিভেদ হিন্দু সমাজের যে কত বড়ো একটা অভিশাপ তা তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারতেন বলেই না তিনি 'জাতিভেদ ও পাতিত্য-সমস্যা' নিয়ে একটি সুন্দর চিন্তাগর্ভ পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। তিনি যে শুধু এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন তা নয়, সমাজ সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে তাঁর দূরদৃষ্টি যে কত গভীর ছিল তার পরিচয় তিনি রেখেছেন এই পুস্তিকার প্রতিটি পৃষ্ঠায়। হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথার দোষ দেখিয়ে তিনি লিখেছেন :

'স্বীকার করতেই হবে যে, জাতিভেদ প্রথার ভীষণ বন্ধনে আমরা আড়ষ্ট হয়ে আছি। অধঃপাতে গেছি, এতই অধঃপাতে গেছি যে, আবার ধর্মের অজুহাতে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে আমরা ছোঁয়া-

ছুঁরি ব্যাপারটিকে বিধিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রশংসা করে থাকি। এখন আমরা সভ্যজগতে সকল জাতির সঙ্গে এক আসরে বসতে চাই, কিন্তু অন্যে আমাদের কী চোখে দেখে, আজ তা তোমাদের ভেবে দেখতে হবে। একথা কি সত্যি নয় যে, সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতি নানা দোষের জন্য আজো আমরা অন্য জাতির অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছি?'

একবার এক প্রকাশ্য সভায় মেথর শ্রেণীর একটি ছেলের হাত থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে পান করে বলেছিলেন: 'আমি রাসায়নিক, আমি জাত মানি না।' তাঁর এই একটি কথার মধ্যেই আমরা যেন সমাজ-সংস্কারক প্রফুল্লচন্দ্রের পরিপূর্ণ মূর্তি দেখতে চাই।

পুজোর ছুটি কাটাতে প্রফুল্লচন্দ্র মাঝে মাঝে যেতেন গ্রাম বাংলার নানান জায়গায়। একবার পুজোর ছুটিতে কাটাতে তিনি গেছেন পাবনা জেলার এক পল্লীগ্রামে. গ্রামের পাশে নদী। পাশে হাট। তিনি নৌকোতেই থাকেন। সকাল বিকেল দুবেলা তিনি লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী পরে উস্কোখুস্কো চুল দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ান গ্রামের পথে ঘাটে। হাটের ব্যাপারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। সাধারণ মানুষ কেউ তাকে চেনেন না। সবাই ভাবেন এই বৃদ্ধ নিশ্চয়ই আশে পাশের কোন গ্রামের একজন। একদিন বিকেলে প্রফুল্লচন্দ্র হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ দেখা গেল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের লঞ্চ হাটের কাছাকাছি এসে নোঙর করেছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লঞ্চ থেকে নেমে হাজির হলেন হাটের মধ্যে। হাটের সবাই ভীত ও আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে। কারণ তখন ইংরেজ আমল। দেশের সাধারণ মানুষ সে সময় উচ্চপদস্থ রাজপ্রতিনিধিদের ভয়ের চোখে দেখতেন। ম্যাজিস্ট্রেট এসে আচার্যদেবকে প্রণাম করে বললেন, "স্যার, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে আপনার ছাত্র ছিলাম।" প্রফুল্লচন্দ্র খানিকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই দেখ, আজ দু'দিন এখানে আছি, গ্রামের লোক ভেবেছে আমি কোন মৌলভী। কিন্তু

তুমি তো প্রণাম করেই খালাস। এরা বুঝল আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চেয়েও বড় হাকিম। তুমি চলে গেলে এরা আমার কাছে কত কি চাইবে —তার কি হবে?" তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হেসে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "বলুন, এঁদের জন্যে কি করতে হবে?" প্রফুল্লচন্দ্র একটু ভেবে বললেন "এঁদের গ্রামে কোন হাসপাতাল নেই। পারবে একটা হাসপাতাল করে দিতে?" এ ঘটনার মাস ছয়েকের মধ্যে দেখা গেল একটি হাসপাতাল তৈরি হয়ে গেছে।

॥ সাত ॥

প্রফুল্লচন্দ্র সারাজীবন দেশের কথা ভেবেছেন, দেশের কাজ করেছেন। ১৯০৯ সালে তিনি যখন 'বাঙ্গালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' এই নামে একটি মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন তখন শিক্ষিত বাঙালির মনে যেন একটা ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল বললেই হয়। তারপর তাঁর সেই চিন্তাগর্ভ রচনাটি সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজি দৈনিক 'বেঙ্গলি'তে অনুবাদ হয়ে বেরুলো, তখন দেশের তরুণদের মধ্যে রীতিমতো আলোড়ন দেখা গিয়েছিল। বাঙালির সামাজিক অধঃপতন ও তার অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যা নিয়ে এমন গভীর অথচ সরলভাবে এর আগে আর কেউ চিন্তা করেন নি। যখন রচনাটি বই হয়ে বেরুলো তখন সেই এক আনা দামের পুস্তিকাটি হাজার হাজার কপি বিক্রী হয়েছিল।

বাঙালির সামাজিক অধঃপতনের অর্থনৈতিক দিকটা এর আগে কেউ আলোচনা করেননি। জীবন সংগ্রামে দাঁড়াতে হলে বাঙালিকে কোন পথ ধরতে হবে, আর কিভাবে সব রকম সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন করতে হবে। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর এই পুস্তিকায় তারই নির্দেশ করেছিলেন। নির্দেশ করা নয়, একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বাঙালির প্রতিভা কয়েক পুরুষ ধরে শুধু কলম পিষে কিভাবে নষ্ট হয়েছে সেই কথাটা প্রথম

চিন্তা করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। বাঙালির অন্ন সমস্যার কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। ১৯১৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রফুল্লচন্দ্র 'অন্ন সমস্যা ও তাহার প্রতিকার' সম্পর্কে একটা সুন্দর বক্তৃতা করেন। সেদিন তাঁর এই বক্তৃতা শুনবার জন্য সভাগৃহ লোকে ভরে গিয়েছিল। বক্তা একমাত্র তিনিই ছিলেন।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক যখন বললেন, 'ল্যাবোরেটরি ছেড়ে, টেস্টটিউব ফেলে দিয়ে, আমি যে আজ আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, এ শুধু পেটের জ্বালায়। বাঙালির জঠরানল আজ প্রজ্বলিত হয়েছে, কিন্তু সেই আগুন নেভাবার মতো অন্ন কোথায়? বাঙালির সামনে আজ আমি একটা সমস্যাই দেখতে পাচ্ছি—জীবন-ধারণ সমস্যা। আজ থেকে এই সমস্যার সমাধানে কাজ করাই হবে আমার জীবনের ব্রত।'—তখন উপস্থিত সকলেই অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বদেশবাসী সেদিন যেন এক নতুন পি. সি. রায়কে দেখেছিল।

দেশসেবক প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয় দিতে হলে খুলনার দুর্ভিক্ষ এবং উত্তরবঙ্গের বন্যার কথা বলতে হয়। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন এই বৈজ্ঞানিক—তিনি ছিলেন সত্যিই একজন মানবতাবাদী—মানুষের দুঃখ তিনি যেন তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। তিনি যখন চতুর্থবার ইংলণ্ড থেকে ফিরলেন সেই সময় খুলনা জেলায় সুন্দরবন অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তাঁর আত্মচরিতে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন যে, কলকাতায় থেকে তিনি অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। মে মাসে গরমের ছুটিতে তিনি যখন গ্রামে এলেন তখনই তিনি দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখতে পেলেন। পর পর দু'বছর অজন্মার ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। দেখলেন, না খেতে পেয়ে কত লোক—শিশু-নর-নারী-মারা যাচ্ছে। কাগজে কাগজে খুলনার দুর্ভিক্ষের খবর বের হল, চারদিকে এই নিয়ে চলছে আলোচনা, কিন্তু খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট অবস্থার কোন গুরুত্ব দিতে চাইলেন না।

তখন প্রফুল্লচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দুর্গতদের ত্রাণের জন্য এগিয়ে এলেন। সেবাকার্যের ব্যবস্থা করলেন এবং অর্থ সাহায্যের জন্য দেশবাসীর কাছে জানালেন আবেদন। ত্রাণকার্যের পুরোভাগে প্রফুল্লচন্দ্র রয়েছেন দেখে দেশবাসী সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিল। বরিশাল ও ফরিদপুর জেলা থেকে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক এসে তাঁর কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করতে লাগল; জননেতারাও এগিয়ে এলেন।

এই দুর্ভিক্ষকে উপলক্ষ্য করে সেদিন তিনি, বিবেকানন্দের দৃষ্টান্তের অনুসরণে, বাংলার শিক্ষিত যুবকদের মানবসেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় ছাত্রসমাজও এগিয়ে এলো। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীদের সাহায্য করবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর ছাত্রদল সেই সময়ে যেভাবে দিনরাত পরিশ্রম করেছিলেন, তা দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। সরকার যখন উদাসীন, দুভিক্ষে কোন সাহায্যই তাঁরা করলেন না, তখন একা প্রফুল্লচন্দ্র দেশবাসীর কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। এজন্য তাঁকে সেদিন দরজায় দরজায় ভিক্ষা করতে হয়েছিল। এইভাবেই সেদিন বিশ্ববিশ্রুত রাসায়নিক বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। দেশবাসী তাঁর সেবাব্রতী মূর্তি দেখে আচার্যদেবের চরণে শ্রদ্ধাবনত হয়েছিল। সেদিন থেকে 'পি. সি. রায়' এই নামটি লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। বৈজ্ঞানিক হলেন মানবপ্রেমিক।

এই দুর্ভিক্ষের ত্রাণকার্যে নেমে প্রফুল্লচন্দ্র চরকা ও খদ্দরের উপযোগিতা বিশেষভাবে বুঝতে পারলেন। দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবলবেগে চলছিল; গান্ধী তখন চরকা ও খদ্দর প্রচার করছিলেন। আচার্য রায় প্রথমে এর বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু খুলনার দুর্ভিক্ষ তাঁর মতের পরিবর্তন সাধন করল। যখন দুর্ভিক্ষের প্রকোপ একটু কমে এলো, তখন তিনি দেখলেন যে, যদি দুর্ভিক্ষ-

পীড়িত নর-নারীরা অবসর সময়ে চরকা কাটতে পারে, তাহলে তাদেরই উপকার হবে। তখন থেকে রাসায়নিকের হাতে উঠল চরকা, পরনে খদ্দর। তিনি নিজে চরকা কাটতে শিখেছিলেন ও নিয়মিতভাবে চরকা কাটতেন।

১৯২২ সাল। পূজোর সময়। উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হলো। রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামগুলো একেবারে ভেসে গিয়েছিল। লোকের ঘরবাড়ি, গরু-বাছুর, শস্য, ক্ষেত-খামার সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বন্যার্ত নরনারীদের সেবার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রিলিফের ব্যবস্থা করলেন। তখন তাঁর বয়স ষাটের কোঠা পার হয়ে গেছে। সেদিন সবাই সবিস্ময়ে দেখেছিল—ক্ষীণদেহ একাকী একটি মানুষ যেন একশো জন হয়ে কাজ করছেন। বিজ্ঞান কলেজে তাঁরই ঘরে বসেছিল বেঙ্গল রিলিফ কমিটি বা বঙ্গীয় সঙ্কট ত্রাণ সমিতির অফিস। সরকারী উদাসীনতার বিরুদ্ধে সেবাকার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করে প্রফুল্লচন্দ্র আর একবার তাঁর অক্লান্ত কর্মশক্তি ও মানবপ্রীতির প্রমাণ দিয়েছিলেন।

১৯২২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ করে প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল। সমস্ত অঞ্চলের বৃষ্টির জল আত্রাই নদীতে এসে জমা হয়ে এই বন্যার সৃষ্টি করেছিল। এই বন্যার সময় সঙ্কট ত্রাণের কাজে আর এক বাঙালি তরুণ এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্র বসু। বন্যার খবর পেয়ে তিনি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। দেশের কাজে সেই তাঁর প্রথম হাতে-খড়ি। প্রফুল্লচন্দ্র ও সুভাষ-চন্দ্রের মিলিত প্রয়াসেই সেদিন বন্যার্তদের সেবার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলেছিল। ভারত-সভা হলে এক জনসভায় প্রফুল্লচন্দ্রকে সভাপতি করে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। সমিতির অফিস তাঁর বাসগৃহে স্থাপিত হয়। ভারতের সর্বত্র এমন কি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকাতেও সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। নানা শ্রেণীর লোক ও নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়ে রিলিফ কমিটি

গঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু একটা আশ্চর্য শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল এই বিরাট সেবাব্রত। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে এই সঙ্কট ত্রাণের কাজের জন্য চাঁদা উঠেছিল সাত লক্ষ টাকা এবং এই চাঁদার একটাপয়সারও অপব্যয় হয়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় জানা যায় যে, প্রফুল্লচন্দ্র যেন তাঁর সমস্ত প্রাণমন এই সেবাকার্যে ঢেলে দিয়েছিলেন। নিজের হাতে কাপড়ের গাঁট বেঁধে দিতেন, ওষুধের মোড়কগুলি প্যাক করতেন। কংগ্রেসের অনেক স্বেচ্ছাসেবক আচার্য রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রিলিফের কাজে যোগদান করেছিল। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ তখন অনেক বার বন্যাপীড়িত অঞ্চল দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে রিলিফের কাজ দেখে খবরের কাগজে তিনি লিখেছিলেন: 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটির কাজ আমি যতই দেখেছি, ততই বিস্মিত হয়েছি। দূর-দূরান্ত গ্রামেও সেবার হাত প্রসারিত হতে দেখেছি। একথা বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না যে, ডক্টর পি. সি, রায়ের নেতৃত্বে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণের যে কাজ হয়েছে, তা বর্তমান ভারতে মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করবার জন্য একটা সুমহৎ প্রয়াসের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

একদিন রিলিফ অফিসে গেছেন সুভাষচন্দ্র। বললেন, চাঁদার জন্য রাস্তায় নামলে কেমন হয়?

—খুব ভালো হয়। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব।

—আপনি কি অত হাঁটতে পারবেন?

—খুব পারব। সকালের দিকে বেরুলে কষ্ট হবে না।

তার পরের দিন সকালে মহানগরীর রাজপথে যে দৃশ্য দেখা গেল তেমন দৃশ্য এর আগে পুরবাসী কখনো দেখেনি। কলকাতার শিক্ষিত যুবক গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে পথে পথে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা-ভিক্ষায় বেরিয়েছে। সমবেত কণ্ঠে তারা গাইছে 'ভিক্ষা দাও, ওগো পুরবাসী'; চারজন একটি বড়ো চাদরের চারটি খুঁট ধরে আছে।

তাদের পুরোভাগে রয়েছেন প্রফুল্লচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র। আচার্যদেবের অনুরোধে কাজী নজরুল ইসলাম এই গানটি বিশেষভাবে রচনা করেন ও তিনিই সুর দিয়েছিলেন। প্রথম দিনের অভিযানে নজরুলও সঙ্গে ছিলেন।

নয় বছর পরে উত্তর ও পূর্ববাংলার কোন কোন অঞ্চলে আবার বন্যা দেখা দিয়েছিল। ১৯৩১ সালের ঘটনা। এর ভয়াবহতা, ধ্বংসের পরিমাণ ও বিস্তৃতি আগের সব বন্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এবারও এগিয়ে এলেন প্রফুল্লচন্দ্র। তখন তাঁর বয়স সত্তর বছর। তিনি নিজেই লিখেছেন: 'বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য আবার ডাক এলো। আমি ও সঙ্কটত্রাণ সমিতি ঐ কাজের ভার নিলাম। আগের মতো এবারও আমাদের সাহায্যের আবেদনে লোকে সাড়া দিল। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা ও অর্থাভাবের জন্য লোকের সহানুভূতি সত্ত্বেও আগের মতো টাকা পাওয়া গেল না।' এবারকার বন্যার রিলিফের কাজ সংগঠন করেছিলেন খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং এর পরিচালনায় তিনি খুব কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

বিহার ভূমিকম্পের সময়ে সেখানকার দুর্গত নর-নারীর সেবা করবার জন্য বেঙ্গল রিলিফ কমিটির কাছে আহ্বান এসেছিল। মহাত্মা গান্ধী এই বিষয়ে অনুরোধ করেন প্রফুল্লচন্দ্রকে। তখন আচার্য দেবের নির্দেশে বিহারে গিয়ে সঙ্কট ত্রাণ সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা রিলিফের কাজে খুব তৎপরতা দেখিয়েছিল। এইভাবেই সেবার ভেতর দিয়ে জাতির তরুণদের মনে সহৃদয়তার বোধ জাগিয়ে দিয়ে, প্রফুল্লচন্দ্র যে একটা কত বড়ো কাজ করে গিয়েছেন, আজ যখন তোমরা এই কথা স্মরণ করবে তখন নিশ্চয়ই সেই মানবদরদী বৈজ্ঞানিকের প্রতি তোমাদের হৃদয় স্বতঃই শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠবে।

আর্তের সেবা করতে গিয়ে রাজনীতির প্রতি প্রফুল্লচন্দ্র কেমন করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সেই কথা একটু বলা দরকার। প্রথম জীবনে তিনি রাজনীতি থেকে দূরেই ছিলেন। তখন তিনি নিভৃতে

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর মন্দিরের পূজারী ছিলেন। তারপর মহাত্মা গান্ধী যখন ইতিহাস-বিখ্যাত অহিংস অসহযোগ আরম্ভ করেন, তখন আচার্যদেব রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। তবে তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ খদ্দর ও চরকা প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর বাইরে তিনি যান নি, যদিও অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় তিনি মনেপ্রাণেই সমর্থন করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন: 'আমি প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিই নি।'

কথাটি সত্য। তাঁর জীবনের সাধনা বিজ্ঞান এবং শিল্পে তার প্রয়োগ। দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচন ছিল তাঁর কর্মের দ্বিতীয় স্তর। ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি প্রধানত এইসব কাজ নিয়েই ছিলেন। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করে বেড়ানো তাঁর শরীরের পক্ষে দুঃসাধ্য আর এ জিনিস তাঁর স্বভাবের বিরোধী ছিল। আসল কথা, ক্ষীণ দেহ, ভগ্ন স্বাস্থ্য ও বার্ধক্য—এই তিনটি কারণে তাঁর পক্ষে রাজনীতিতে যোগদান করা সম্ভব ছিল না। তথাপি গভীর আন্তরিকতা ও বিশ্বাস নিয়েই শেষ বয়সে রাজনীতির আসরে তিনি নেমেছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের যা প্রধান কর্মসূচী—খদ্দর ও চরকা—তার বাণী সেদিন সমস্ত বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরেও প্রফুল্লচন্দ্র যেভাবে প্রচার করেছিলেন তার তুলনা নেই। এজন্য অনেকে তাঁকে খদ্দর্ষি অর্থাৎ খদ্দর-ঋষি বলে সেদিন উপহাসও করেছিল। তিনি এই সময়ে বলেছিলেন: 'বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা করতে পারে না।' ষাট বছর বয়সে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র দেশের সর্বত্র অবিশ্রান্ত ঘুরে জাতীয় বিদ্যালয় রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, খদ্দর প্রচলন ও অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য প্রচারকার্য করতেন। লোকে তাঁর কর্মশক্তি দেখে অবাক হতো। এছাড়া, একাধিক জেলা সম্মেলনে তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হতো, কারণ ঐ-সময়ে নাম-করা প্রায় নেতাই কারান্তরালে ছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের

অনেক আগেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রর্বতক মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আচার্য রায় নিজেই লিখেছেন : '১৯০১ সালের শেষভাগে গোপালকৃষ্ণ গোখেলের অতিথিরূপে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি কলকাতায় আসেন—ইনিই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বলা বাহুল্য, বয়সে অনেক ছোট হলেও প্রথম থেকেই তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমাদের দুজনার স্বভাবের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল ছিল—ত্যাগ ও ধৈর্যের প্রতি নিষ্ঠা। এই কারণেও আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে; মহাত্মাজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে।' দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশার কথা তাঁর দেশবাসীকে জানাতে তিনি ঐবছর (১৯০১) কলকাতায় এসেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন এর বিশ বছর পরের ঘটনা।

তেমনি বাংলার সর্বত্যাগী মহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্র কি রকম আকর্ষণ বোধ করতেন তার পরিচয় মিলবে দেশবন্ধুর কারাদণ্ডের পর দেশজননী বাসন্তীদেবীকে লেখা একটি চিঠি থেকে। এই চিঠির তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২২। তিনি লিখেছেন : 'প্রিয় ভগ্নি, আপনার স্বামীর অশেষ বদান্যতা, তীব্র স্বদেশপ্রেম, মহান্ আদর্শবাদ, সর্বদাই লোকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যদিও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ আছে —তবুও চিরদিনই আমি তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছি। …চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা তাঁহার শত্রু-মিত্র সকলেই একবাক্য করিয়া থাকেন। তাঁহার এই অগ্নিপরীক্ষার দিনে, সকলের সহিত আমারও চিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবিত হইতেছে।'

একটি ঘটনার কথা বলি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক সভার আয়োজন হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সভায় নিজের হাতে চরকা কাটবেন বলে খবরের কাগজে ঘোষণা করা হয়েছিল। সভায় তিল

ধারণের জায়গা নেই—এত লোক এসেছে। বক্তৃতা-মঞ্চে বসে আছেন গান্ধী-প্রফুল্লচন্দ্র। দুজনেই চরকায় সূতো কাটতে আরম্ভ করলেন। তারপর নজরুল গাইলেন : 'ঘোররে ঘোর ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর' গানটি। গান থামলে শুরু হয় গান্ধীজির বক্তৃতা : 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একজন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ইনি এতদিন আমার চরকা-মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে এসেছেন। বিজ্ঞানের যুগে চরকা নাকি অচল। কিন্তু আজ আপনারা দেখতে পেলেন তিনি আমার সঙ্গে সমানভাবে চরকা কাটলেন। তিনি আজ আমার মতবাদে বিশ্বাসী।'

সেই থেকে ঘরে-বাইরে প্রফুল্লচন্দ্রের মুখে একটি কথাই শোনা যেতো : 'আগে অন্ন-বস্ত্র, আগে খদ্দর-চরকা, আগে স্বরাজ তারপর অন্য কিছু।' এইভাবেই তিনি গান্ধীর চরকা ও খদ্দরকে শুধু নৈতিক সমর্থন দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, এর প্রচারে তিনি শ্রম ও অর্থ দুই-ই অকাতরে ব্যয় করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন মহান্ দেশপ্রেমিক ছিলেন।

=আট=

১৯২১ সাল থেকে প্রফুল্লচন্দ্র শুধু খদ্দর ও চরকা নিয়েই ছিলেন না, জাতীয় শিক্ষা বিস্তারেও তিনি একটা প্রধান অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষায় বিশ্বাস করতেন। যখনি জাতীয় শিক্ষা দেবার জন্য নতুন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বা কোন প্রচেষ্টা হয়েছে, তখনি তিনি তাতে সাহায্য করেছেন। শিক্ষাব্রতী প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা আজো তার মূল্য হারায়নি। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী তিনি আজীবন ছিলেন। যখন তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন তাঁরই উৎসাহ ও চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ নতুন কর্মক্ষেত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল।

প্রফুল্লচন্দ্রই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলেছিলেন 'গোলামখানা' আর স্নাতকদের বলেছিলেন 'মার্কাধারী মূর্খ'। বলেছিলেন: 'বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি অজ্ঞতা ঢাকবার ছদ্মবেশ মাত্র।' তাঁর এই রকম মন্তব্যে সেদিন তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। কিন্তু তিনি যে সেদিন একটা মূল সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন সেটা তাঁর স্বদেশবাসী অনেকেই বুঝতে পারেন নি। ফাঁকা আওয়াজ করার মানুষ ছিলেন না প্রফুল্লচন্দ্র। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ও জীবনসংগ্রামে তার দাম কি—এই প্রশ্নটাই তিনি

সেদিন আমাদের সামনে রেখে বড় দুঃখের সঙ্গেই বলেছিলেন : 'যেমন করেই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা না মিললে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে —এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। আমাদের দেশের অভিভাবকদের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে ভাবী জীবনযাত্রার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঋণী নন এমন অনেককে আমি জানি যাঁরা আত্মচেষ্টা ও পুরুষ-কার বলে জীবনসংগ্রামে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন।'

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কলকাতা ও মাদ্রাজের বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় স্নাতক বেরিয়েছে। এর ফল কি হয়েছে? প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন: 'ডিগ্রী পাওয়ার জন্য এই অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা (একে তিনি 'পাগলামি' বলেছেন) ব্যাধি-বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ঘোর অনিষ্ট করছে। জাতির মানসিক উন্নতি ও সংস্কৃতির মূলে এ বিষের মতো কাজ করছে। এখন যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, তার ফলে এমন এক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকের সৃষ্টি হচ্ছে, যাদের কোন কর্মপ্রেরণা, উৎসাহ ও শক্তি নেই এবং জীবন-সংগ্রামে তারা নিজেদের অসহায় বলেই বোধ করে।' তাঁর এই কথাগুলো কী আজো সত্য নয়?

স্বাধীন ভারতে ইংরেজি ভাষার বদলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার নীতি নেওয়া হয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, এর কত কাল আগে শিক্ষব্রতী প্রফুল্লচন্দ্র এই সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন। ১৯২৬ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন: এদেশে এখন যে শিক্ষাপ্রণালী চলছে তার প্রধান ত্রুটি হলো বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা। এটা আমরা অল্পদিন হলো বুঝেছি। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে প্রথম থেকেই শিক্ষা দিলে ছেলেদের বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ইংরেজি বা অন্য কোন বিদেশী ভাষার প্রতি আমি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রকাশ করছি না; কেননা ঐ সব ভাষা শিক্ষার

ফলে জ্ঞানরাজ্যের নতুন দরজা খুলে যায়। আমার কথা এই যে, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষার বনিয়াদ মাতৃভাষার সাহায্যেই গড়ে ওঠে।'

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন শিল্প-পাগল মানুষ। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা দেশীয় শিল্প প্রয়াসের ভেতর দিয়ে কিভাবে সার্থকতা লাভ করেছিল, তার দৃষ্টান্ত শুধু তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল নয়। তিনি আরো কয়েকটি দেশীয় শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। নতুন শিল্পস্থাপনের জন্য তিনি অনেক নতুন কোম্পানীতে টাকা দিয়েছিলেন, ডিরেক্টরও হয়েছিলেন। অনেক কোম্পানির গণেশ উল্টে যাওয়ার জন্য বিস্তর টাকা লোকসান দিয়েছিলেন, সময়ে সময়ে বদনামও পেয়েছিলেন। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করতেন না। বলতেন, 'এমনি করেই সফলতা-বিফলতার ভেতর দিয়ে বাঙালি ছেলেরা স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। দুচারটে কোম্পানি 'ফেল' পড়লে উদ্যম নষ্ট হবে কেন?'

এর থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর স্বদেশবাসীর ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র যেন একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করতেন। নিছক কেরানিগিরি করে বাঙালি তরুণ তার প্রতিভা বা উদ্যমের অপচয় করবে, এ তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বাঙালি ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে অগ্রসর হয়ে স্থাপন করেছে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কে বেঙ্গল কেমিক্যালের 'একাউন্ট' খোলা হয়েছিল। ব্যাঙ্কটি যেদিন দরজা বন্ধ করে তার আগের দিনও বেঙ্গল কেমিক্যালের কয়েক হাজার টাকা কোম্পানির অন্যতম পরিচালক প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশে জমা দেওয়া হয়। কোম্পানির অনেক টাকা মারা গেল। অংশীদারদের এক সভায় বিষয়টি উঠলো আলোচনার জন্য। একজন বললেন, দেশী ব্যাংকে আর যেন টাকা রাখা না হয়। প্রফুল্লচন্দ্র উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই রাখা হবে। দেশীয় উদ্যোগকে বিশ্বাস করতেই হবে।'

প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যে কয়টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান জড়িত ছিল সেগুলির নাম হলো :(১) বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস (২) বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, (৩) বেঙ্গল ক্যানিং অ্যাণ্ড কণ্ডিমেণ্ট ; (৪) বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ; (৫) বেঙ্গল পেপার ; (৬) বেঙ্গল স্টিম নেভিগেশন এবং (৭) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিলস। এছাড়া সেই সময়ে ছোট বড়ো অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁরই আশীর্বাদ সম্বল করে স্থাপিত হয়েছিল। ডিগ্রীর মোহে অন্ধ বাঙালি যুবককে স্বাধীন জীবিকার ক্ষেত্রে পরিচালিত করবার মতো মানুষ সেদিন বাংলায় একজনই ছিলেন। তিনি সর্বজন-অন্বেষিত পি. সি. রায়। 'ওরে চাকরি করিস নি, কলম পিষে জীবনটা নষ্ট করিস নি, ব্যবসা কর'—সেদিন প্রত্যেকটি শিক্ষিত বাঙালি যুবকের প্রতি এই ছিল তাঁর নির্দেশ। জীবিকা অর্জনে বাঙালি তরুণকে স্বাবলম্বনের পথ দেখাতে সে-যুগে তাঁর মতো আর কেউ প্রয়াস পাননি। প্রফুল্লচন্দ্রের জনপ্রিয়তার এটাই ছিল মূল কথা।

প্রফুল্লচন্দ্র সব সময়ই বলতেন যে কোন কাজের আসল মূলধন হ'ল শ্রম। এ বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের এক সহযোগী বলেছিলেন : শ্রমের মর্যাদা তিনি দিতেন এবং বুঝিতেন। শীতের দিন বলিতেন, ঘাম হয় না এই তো কাজের সময়। যত কাজই করিস গ্লানি আসিবে না। গরমের দিনে বলিতেন। দেখ কত বড় বেলা, অফুরন্ত সময়। কাজ কর। কাজ করিলেই ফল পাবি। শ্রমসাধ্য কাজ করিয়া যাহারা জীবনযুদ্ধে সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাহাদের কথা বলিতেন। এই ক্ষেত্রে টাটা, বিড়লা কিম্বা গোকুল সিং তাহার নিকটে একই পর্যায়ের। আসল কথা সফলতার কাহিনী। শেষোক্ত গোকুল সিং বেঙ্গল কেমিক্যালের গাড়ির ঠিকাদার। এই ক্ষুদ্র জীবনও তাঁহার আত্মচরিতে স্থান পাইয়াছে। একদিন বেঙ্গল কেমিক্যালের তদানীন্তন ম্যানেজার জগদিন্দ্র লাহিড়ী মশায়কে বলিতে শুনিলাম—

দেখ, দেখ, গোকুল সিং হতে পারবি। ছাতু খেয়ে, একখানা গরুর গাড়ি থেকে আজ "চৌধুরি,"...

ব্যবসায় বিমুখ বাঙালিকে স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিকের তখন চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না। বেঙ্গল কেমিক্যাল করে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, বাঙালির প্রতিভা ইচ্ছা করলে কী অসাধ্য সাধনা করতে পারে। পরে অনেকগুলি শিল্প-উদ্যমের সঙ্গে জড়িত থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন: 'ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করতে হলে যে দুটো প্রধান গুণের দরকার তা বাঙালির চরিত্রে নেই—সে দুটো গুণ হলো ব্যবসায় বুদ্ধি ও ব্যবসার প্রতি অনুরাগ।' তাইতো দেখি যখন যে কেউ ব্যবসায় নেমে তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছে প্রফুল্লচন্দ্র তাকে তিনটি উপদেশ দিতেন, যথা—'ছেড়ে দিও না, টিকে থাকো; ব্যবসায় নামবার আগে শিক্ষানবিসী করবে আর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবসা করবে।' সেদিন তাঁর উৎসাহ ও পরামর্শে কত শিক্ষিত বাঙালি যুবক চায়ের দোকান, বইয়ের দোকান, ছাতার দোকান করতে এগিয়ে এসেছিল। এমনি করেই রসায়নবিদ সেদিন নিজেকে বাঙালির বৃহৎ সমাজজীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৩২ সালটি আচার্য রায়ের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে দুটি কারণে। প্রথম, এই বছরে প্রকাশিত হয় তাঁর বহু প্রতীক্ষিত আত্মচরিত: Life and Experience of a Bengali Chemist, অর্থাৎ এক বাঙালি রাসায়নিকের জীবন ও অভিজ্ঞতা। তাঁর বৈচিত্র্যবহুল সুদীর্ঘ জীবনের নানা ঘটনা, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার রসায়নে মিশ্রিত করে, প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর স্বজাতিকে যা উপহার দিলেন তা শুধু তাঁর আত্মকথা নয়, সমস্ত বাঙালিজাতির একটা বিশেষ কালের ইতিহাস—অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বইটির মধ্যে যা কোথাও আত্মমহিমা প্রচারের প্রয়াস নেই, বরং এর মধ্যে যা আছে তাকে আত্মবিস্মৃত জাতির ইতিহাস বলা যেতে পারে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে তাঁর এই আত্মচরিত তিনি উৎসর্গ করেছেন ভারতের তরুণ সম্প্রদায়কে। ইংরেজি বইটি বেরুবার পাঁচ বছর পরে 'আত্মচরিত' নাম দিয়ে এর একটা বাংলা সংস্করণ বের হয়।

দ্বিতীয় কারণ প্রফুল্ল-জয়ন্তী।

তাঁর জীবনের ৭১ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির পক্ষ থেকে আচার্য-দেবকে এক প্রকাশ্য জনসভায় সংবর্ধনা দেবার আয়োজন হয়। 'প্রফুল্লচন্দ্র-জয়ন্তী' সমকালীন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—যেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'। রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম একই বছরে, মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে। প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যর নীলরতন সরকার ছিলেন প্রফুল্ল-জয়ন্তী কমিটির সভাপতি; অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৩২, ১০ই ও ১১ই ডিসেম্বর—এই দুদিনে দুটি অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছিল প্রফুল্ল-জয়ন্তী। প্রথমটি হয় পৌরসভার পক্ষ থেকে আর দ্বিতীয়টি জনসাধারণের পক্ষ থেকে।

বাঙালি সেদিন প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল তাদের প্রিয়তম এই মানুষটিকে। চাঁদা উঠেছিল ১৬,৮৫২ টাকা আর মোট খরচ হয়েছিল মাত্র ১৪৬ টাকা। এমন জয়ন্তী উৎসব আর কারো হয়নি। নিউ মার্কেটের বাঙালি ফুলওয়ালারা বিনা পয়সায় সব ফুল সরবরাহ করেছিল; ছাপাখানা—জয়ন্তী-উৎসবের কাগজপত্র ছাপতে একটি পয়সাও নেয়নি; কাগজ ব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্ত বিনা পয়সায় কাগজ দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র টাউন হলের ভাড়া ও ডাক টিকিটের খরচা বাবদ খরচ হয়েছিল ১৪৬ টাকা। সংগৃহীত মোট চাঁদার অবশিষ্ট ১৬,৭০৬ টাকা দিয়ে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যদানের জন্য একটা স্থায়ী ফাণ্ড (Fund) খোলা হয়েছিল। ছাত্র বৎসল প্রফুল্লচন্দ্র 'জয়ন্তী কমিটির' এই কাজের খুব প্রশংসা করেছিলেন।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে নাগরিকদের পক্ষ থেকে আচার্য রায়কে

একটি মানপত্র ও রূপোর তৈরি একটা চরকা দেওয়া হয়েছিল। মানপত্রটি পাঠ করেন তখনকার পৌরপ্রধান (Mayor) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। এই মানপত্রটির প্রতিলিপি তোমাদের কাছে তুলে ধরছি :

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মহাশয়ের করকমলে

আচার্যদেব !

আপনার কর্মবহুল বৈচিত্র্যময় জীবন দ্বিসপ্ততিতম বর্ষে উপনীত হইয়াছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের সেবায় ও দেশমাতৃকার পুণ্য আরাধনায় আপনার জীবনে আত্মোৎসর্গের যে দিব্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে তদ্বারা আপনার স্বদেশবাসী প্রকৃত উন্নতি পথের সন্ধান পাইয়াছে।

হে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ! আপনার নিষ্কাম জনসেবা, এবং আজীবন দৈন্যবরণ এই মহিমোজ্জ্বল ভারতভূমির ঋষি ও তপস্বিগণের অনবদ্য আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

বিদ্যার যে বিশেষ রূপের আরাধনা আপনি আজীবন করিয়াছেন, সেই রসায়নবিদ্যায় অতীত ভারতের আচার্যগণ অপূর্ব কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সেই কৃতিত্বের গৌরবময় ইতিহাস বিশ্বজনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া এবং স্বীয় মৌলিক গবেষণা দ্বারা আপনি জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

আপনার সাধনায় ও জ্ঞানলিপ্সায়, তপস্যায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার বহু কৃতী শিষ্য রসায়নবিদ্যায় একাগ্র সেবায় ব্রতী থাকিয়া বিদ্বজ্জন সমাজে ভারতের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন।

দেশের আর্থিক দুর্গতি, সমাজের নানা অবিচারে ও পল্লীজীবনের দুঃখদুর্দশা মোচনকল্পে আপনার আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম, এবং খদ্দর ও চরকা শিল্প প্রচারে আপনার একান্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহ সমগ্র জাতির প্রাণে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে।

হে কর্মযোগী ! হে স্বাধীনতার অগ্রদূত ! হে বঙ্গজননীর কৃতিসন্তান। আজ এই পুণ্য জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরজনপক্ষ হইতে আপনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম। আপনি আমাদের অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

"বন্দে মাতরম্"
আপনার গুণমুগ্ধ
কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যবৃন্দের
পক্ষে
বিধানচন্দ্র রায় মেয়র

কলিকাতা
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

আচার্যদেব সম্পর্কে এই মানপত্রটি পড়া হলে সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি উঠলো। হৃষ্টচিত্তে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করলেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন : 'যশের প্রত্যাশা না রেখেই আমি নীরবে বিজ্ঞান-চর্চায় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি অতিবাহিত করেছি। দেশ-মাতৃকার চরণে আমি যে সামান্য অর্ঘ্য দিতে পেরেছি, এতেই আমি কৃতার্থ বোধ করি, এর বেশি সম্মান লাভে আমার আকাঙ্ক্ষা কোন-দিনই হয়নি।

'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সত্তর বছর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবি বলেছিলেন :

'আমরা দুইজনে সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁছেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।...আচার্যের শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। প্রথম বয়সে তাঁর প্রতিভা বিদ্যাবিতানে মুকুলিত হয়েছিল, আজ তাঁর সেই প্রতিভার প্রফুল্লতা নানা দল বিকাশ করে দেশের হৃদয়ের মধ্যে উদ্ঘারিত হলো। সেই অসামান্য প্রতিভা আজ অর্ঘ্যরূপে ভারতের বেদীমূলে নিবেদিত। ভারতের আশীর্বাদের সঙ্গে আজ আমাদের সাধুবাদ মিলিত হয়ে তাঁর মাহাত্ম্য উদ্‌ঘোষণ করুক।'

শুধু অভিনন্দন রচনা করা নয়, সেদিন কবি ব্যক্তিগতভাবে নিজের হাতে রসায়নবিদকে আরো দুটি জিনিস উপহার দিয়েছিলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ Mahatma Gandhi and the Depressed Humanity গ্রন্থটি প্রফুল্লচন্দ্রের নামেই উৎসর্গ করেন। কারুকার্য খচিত একটি সুন্দর চামড়ার আধারে সংরক্ষিত সেই পুস্তিকার একটি কপি সেই সংবর্ধনা সভায় কবি প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি আরো একটা জিনিস উপহার দিলেন :

প্রেম রসায়নে ওগো সর্বজন প্রিয়,
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।

—কবি এই দুই ছত্র কবিতা রচনা করে শিল্পসুষমামণ্ডিত একটি তাম্রফলকের ওপর সেটি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। বেলে পাথরের তৈরি একটি সুদৃশ্য আধারে ফলকটি রক্ষিত ছিল। ফলকটির আচ্ছাদনীতে নন্দলাল বসু একটি সুন্দর মূর্তি এঁকে দিয়েছিলেন। কবি সেই তাম্র ফলকটি প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে তাঁর ব্যক্তিগত উপহার হিসাবে প্রীতিভরে অর্পণ করেন।

দ্বিতীয় দিনের জয়ন্তী-উৎসবের আর-একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ছিল আচার্যের হাতে একটি স্মারক গ্রন্থ[১] প্রদান। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন স্মারকগ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। চুয়াত্তরটি রচনা-সম্বলিত এই স্মারক গ্রন্থখানি যাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল, তাঁদের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের সতীর্থ জগদীশচন্দ্র বসুর রচনাটি থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিলাম : 'একটি জীবনে এতখানি সিদ্ধিলাভ সত্যই অভিনব, কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য, দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত কিছুই ব্যয় করেছেন। বিজ্ঞান গবেষক ও শিল্পের পথিকৃৎ—এই

১। Acharya Prafulla Chandra Roy Commemoration Volume—Edited by Dr. S. C. Law.

দ্বৈতরূপে তিনি সত্যই স্বদেশের মঙ্গল বিধাতা। তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছরের বন্ধু হিসাবে আমি জানি তাঁর অতি সাধারণ জীবনযাত্রা ও আত্মোৎসর্গ রয়েছে এই কাজের মূলে।'

সেদিন প্রফুল্ল-জয়ন্তী সারা বাংলায় ও বাংলার বাইরে একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিপালিত হয়েছিল। যারবেদা জেল থেকে গান্ধী পাঠিয়েছিলেন শ্রদ্ধাবাণী। একটি মানুষকে কেন্দ্র করে এমন সার্বজনীন জয়ন্তী উৎসব এর আগে বা পরে এদেশে আর হয়নি। এর থেকেই প্রফুল্লচন্দ্রের জনপ্রিয়তা কিছুটা অনুভব করা যায়। মহৎ তাঁর জীবন-সায়াহ্নে তাঁর গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসীর কাছ থেকে বুঝি স্নেহ-প্রীতি শ্রদ্ধা-অভিসিঞ্চিত সেই দুর্লভ পুরস্কারই লাভ করলেন।

দুর্লভ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী তিনি ছিলেন। কিন্তু সকলের ওপরে মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র। এই মানুষকে খুঁজতে হবে ল্যাবোরেটরির বাইরে। সহজ, সরল মানুষ। শিক্ষিত বাঙালীর মনের মানুষ পি. সি. রায়, আর সর্বসাধারণের তিনি ছিলেন মনে রাখার মতো মানুষ। বিপিনচন্দ্র পালের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সরলতার মূর্ত প্রতীক। বিদ্যাসাগরের পর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো অন্য কোন সুপরিচিত ব্যক্তি বোধ হয় এমন সহজ ও সাধারণ জীবনযাপন করেননি। সেই বিরাট প্রতিভার অন্তরে ছিল অতি স্নেহশীল একটি মানুষ। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের ছোট্ট একটি ঘটনা তোমাদের কাছে তুলে ধরলেই তা তোমরা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্র ভবেশচন্দ্র রায়কে সঙ্গে নিয়ে বাঙ্গালোর যাচ্ছেন। ঐ একই গাড়িতে ভ্রমণ করছেন তদানীন্তন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এর পরের ঘটনাটুকু প্রসঙ্গে ভবেশচন্দ্র রায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন: একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আচার্যদেবের সঙ্গে বাঙ্গালোর যাচ্ছিলাম। রিজার্ভ-কুপে, তাই অন্য কোন যাত্রী সে গাড়িতে নেই। অন্য দুইটি বিভিন্ন কামরায় ছিলেন

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আর ডঃ প্রমথ ব্যানার্জী। সন্ধ্যায় মাদ্রাজ মেলে হাওড়া থেকে রওনা হ'লাম—রাতের খাবার সঙ্গে ছিল, যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘুম দেওয়া গেল। পরদিন সকালে একটা বড় স্টেশনে ১০/১৫ মিনিটের জন্য গাড়ি থামল, আচার্যদেব প্লাটফর্মে নেমে পায়চারি করছেন—ডঃ মুখার্জী আর ডঃ ব্যানার্জীও তাঁর সঙ্গে। আচার্যদেব শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে বললেন—আমাদের দুপুরের খাবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে। আচার্যদেবের নিজের জন্য কিছুই দরকার ছিল না, তবে আমার জন্যই তাঁর যা কিছু দুশ্চিন্তা। শ্যামাপ্রসাদ বাবু সঙ্গে সঙ্গে গার্ডকে ডেকে বলে দিলেন একটা 'মিল' যোগান দিতে। যথাসময়ে মিলটি পেলাম এবং খাওয়া হয়ে গেলে রেলের লোকেরা এসে টিফিন কেরিয়ারটি নামিয়েও নিয়ে গেল। বেলা একটা আন্দাজ আচার্যদেব বললেন, "ওরে, এই বেলা শ্যামাপ্রসাদকে বলে আয় রাত্রের খাবার একটা ব্যবস্থা যেন করে রাখে।" গার্ডকে দেখে, তাকে বলে দিলাম রাত্রের খাবারের কথা এবং গার্ড জানাল যথাসময়ে আমাদের টিফিন কেরিয়ারে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হবে। আচার্যদেব এতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। আরও তিন চার বার তিনি আমাকে বললেন—"যা শ্যামাপ্রসাদকে বলে আয় তোর খাবার কথা।" অবশেষে তাঁকে একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললাম—"দেখুন আমার তিরিশ বছর বয়স হল। আমি বিজ্ঞান কলেজে চাকরি করি। আমি উপাচার্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে বলব—আপনি দয়া করে আমার রাতের খাবার ব্যবস্থা করুন—এটা কি করে হয়, বিশেষত আমি তো গার্ডকে বলেছি এবং গার্ড ব্যবস্থা করে জানিয়েছেনও।" আচার্যদেব আর দ্বিতীয়বার এ সম্বন্ধে কোন কথা তুললেন না। ব্যাপারটা মিটে গেল দেখে আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

বেলা চারটে আন্দাজ পিট্টাপুরম স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। আমাকে কি একটা কাজের ফরমায়েস দিয়ে আচার্যদেব প্লাটফরমে নেমে পড়লেন পায়চারি করতে—এগিয়ে চললেন পিছন দিকে প্রথম শ্রেণীর

কামরার দিকে। আচার্যদেব যখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন তখন হঠাৎ একটা হুইশ্‌ল্ দিয়ে গাড়ি দিল ছেড়ে, আচার্যদেব রইলেন প্লাটফরমে পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আটাত্তর বছরের বৃদ্ধ হঠাৎ পড়ি কি মরি করে দৌড়ে এসে কামরার পা-দানিতে দাঁড়িয়ে হাতল ধরে ঝুলতে লাগলেন। আমি হতভম্ব! তাড়াতাড়ি আচার্যদেবকে টেনে ধরলাম যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে। সারা প্লাটফরমের লোকজন হাঁ হাঁ-চীৎকার করে উঠল। কয়েক গজ এগিয়ে ট্রেন থেমে গেল।

শ্যামাপ্রসাদ বাবু, ডঃ ব্যানার্জী ছুটতে ছুটতে এসে কামরায় ঢুকলেন এবং আচার্যদেবকে বললেন—"এ আপনি কি করছিলেন?" আচার্যদেব দম নিয়ে বললেন, "জান, আমি খুলনা জেলার লোক, ছোটবেলা তর তর করে নারকেল গাছে চড়তাম। তাছাড়া একবার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে যাচ্ছিলাম, সেবার এই রকম হাতল ধরে ঝুলে প্রায় ৩।৪ মাইল গিয়েছিলাম।" শ্যামাপ্রসাদ বাবু অনুযোগ করলেন, "কিন্তু কেন এ risk নিচ্ছিলেন? এটা অত্যন্ত অন্যায়" ইত্যাদি। আচার্যদেব চুপচাপ সব অনুযোগ হজম করেছিলেন। হঠাৎ বললেন: "কি জান—এই ছেলেটার জন্য; রাতের খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য তোমাকে যেয়ে বলতে ওর লজ্জা করে, উনি রাতে উপোস করবেন তবুও লজ্জায় তোমাকে বলবে না—রাত উপোসে হাতী শুকোয় —এটা ওকে কিছুতে বোঝাতে পারলাম না।"—তখন লজ্জা পেয়েছিলাম; আজ ভাবি কি স্নেহ, কি অনুকম্পা, কত বড় এই হৃদয়!"

১৯৪৪, ১৬ই জুন।

আপার সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজের সেই ঘরটিতে তিরাশী বছর বয়সে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন-দীপ নিভে গেল।

বড়ো হয়ে তোমরা প্রফুল্লচন্দ্রের কথা আরো অনেক জানবে। তখন ভারতের এই বিজ্ঞানসাধককে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে আর তাঁকে প্রণাম জানাবে এই বলে:

নব নালন্দা তব চারিপাশে আবার লভেছে স্ফূর্তি,
তোমার মাঝারে নাগার্জুনের ব্রত ধরিয়াছে মূর্তি।

আচার্যবাণী[১]

১। আমাকে যদি কেউ একদিনের জন্যও কলকাতার সর্বময় কর্তা করে, তবে আইন কলেজটিকে (Law college) আগে ভূমিসাৎ করি। অন্তত দশ বছরের জন্য আইন পড়া উঠিয়ে দিই।

২। যুবকগণের প্রতি আমার নিবেদন, ফেল করে তারা যেন জগৎ অন্ধকার না দেখেন এবং ক্ষোভে ও দুঃখে আত্মহত্যা না করে বসেন। বিশ্ববিদ্যালয় দরজা বন্ধ করলে কি টাকা-পয়সা বা মনুষ্যত্বের দরজা বন্ধ হয় ?

৩। পরিবর্তনশীল জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে বুদ্ধি, কৌশল ও প্রাণশক্তির বলে যারা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে তারাই টিকে যায়।

৪। অন্ধ দেশপ্রীতি সত্যের পথে বড় বাধা দেয়। আমাদের দেশের আচার ব্যবহার বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি যা কিছু সবই ভাল—এরূপ বিশ্বাসের দিকে যাঁদের মনের খুব ঝোঁক, কোন রকম সংস্কারের কথায় তাঁরা কখনই আমল দেবেন না।

৫। গলাবাজী দেশে প্রচুর হয়েছে। এই যে ভাবের বন্যায় আজ দেশ কানায় কানায় ভরে গিয়েছে, এবারকার প্লাবনে দেশ যাতে স্নিগ্ধ মধুর শস্য-শ্যামল হয় তার আয়োজন করতে হবে।

৬। আমরা শুধু বাঙালি নই—আমরা মানুষ, যুগে যুগে দেশে যে মানুষ হয়েছে, কাজ করেছে, স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে আমরা তাদের ভাই। আমরা বিশ্বের সর্ববিধ সত্যের সর্ববিধ ধনের সমান অধিকারী।

৭। ছাত্রদের দিকে আগ্রহাকুল নয়নে আমি তাকিয়ে থাকি। যদি দেখি তারা মানুষ হচ্ছে তবে ভাববো আমার জীবনব্রত সফল হলো। ছাত্রদের আমি সব সময়ে বলি মানুষ হও, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও—তখন দেখবে দেশ আবার নিশ্চয়ই উঠবে।

৮। আজকাল রব উঠিয়াছে বিহার বিহারীদের, আসাম অসমীয়াদের, উড়িষ্যা ওড়িয়াদের, কিন্তু বাংলা সকলের। সকলের জন্য বাঙালি ঘরের দ্বার খুলিয়া দিবা আরাম শয্যায় পড়িয়া আছে, কেননা বাঙালি বড় পরমার্থিক জাতি—বিশ্বকে আপন করিতে চাহে।

৯। এখনকার দিনে জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি—বলে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আলস্য ত্যাগ করো, উন্নতির জন্য উঠেপড়ে লাগা চাই, ভাল করে খাওয়া চাই-ই।

১০। 'এক জাতি, এক ভগবান, এক দেশ, এক মন প্রাণ'—এই আদর্শ গ্রহণ না করিলে ভারতের মুক্তি শত শত বৎসরেও সম্ভব হইবে না।

১। 'আচার্য বাণী' থেকে সংকলিত।

বিজ্ঞান সাধক প্রফুল্ল চন্দ্র • মণি বাগচি